দেবী

আমি প্রথম সারির তিনটি সরকারি মেডিকাল কলেজের একটিতে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। সঙ্গত কারণেই আমার পরিচয় প্রকাশ করতে সাহস পেলাম না। আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র ছিলাম তখন ১৪ ফেব্রুয়ারিতে শহরে ঘুরতে গিয়ে দেখি পার্ক, ফাস্ট ফুডের দোকানে জোড়া জোড়া কপোত–কপোতী। কেউ বা তারা রিকশায় ঘোরাঘুরি করছে।

সত্যি হিংসা হতো আমার। কারণ তখনো কাউকে এভাবে জড়াইনি জীবনের সঙ্গে। সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইলাম সামনের ভালোবাসা দিবসে যাতে আমাকে এভাবে নিঃসঙ্গ থেকে কষ্ট পেতে না হয়। থ্যাংকস আল্লাহ। তিনি আমার এই প্রার্থনাটুকু রেখেছেন।

ফার্স্ট প্রফেশনাল পরীক্ষা দেয়ার পর দুই মাস ছুটি। ছুটি কাটাতে বাড়ি গেলাম। নিতান্তই গ্রামে আমার স্থায়ী আবাস। সারাক্ষণ বাড়িতে থাকতে ভালো লাগছিল না। সকাল দশটার পর পরই আমার হাতেখড়ি যে স্কুলে সেটার সামনে অনর্থক হাটাহাটি করতাম বন্ধুদের নিয়ে। কখনো কখনো স্যারদের সঙ্গে দেখা করতাম।

একদিন আমার এক প্রিয় স্যারের সঙ্গে কথা বলার সময় অপরূপা এক মেয়ের সঙ্গে আমার চোখাচোখি। চঞ্চলা মেয়েটির চোখ কি যেন একটা বলে গেল বুঝতে পারলাম না।

হৃদয়ের গহীনে শিহরণ অনুভব করলাম। পর পর কয়েকদিন যে কি অস্থিরতায় ছিলাম তা একমাত্র আমিই জানি।

স্কুলের সামনে একটা লাইব্রেরি। প্রতিদিন লাইব্রেরিতে বসে তাকে ফলো করতাম। একদিন সে এলো খাতা কিনতে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকলাম তার চোখের পানে, যদি আবার সেই চাহনি পাই এ আশায়।

খাতা কেনার সময় হঠাৎই আমার নাম জিজ্ঞাসা করে বসলো।

আমার মনে হলো, আমি নিজের নাম ভুলে গেছি।

অবশেষে নামটা বললাম। সাহস নিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলাম। জানতে পারলাম সে ক্লাস নাইন–এর ছাত্রী। ফার্স্ট গার্ল। সাহিত্যের জগতে তার অবাধ বিচরণ। নিজেই কবিতা লেখে ইত্যাদি। এ বয়সেই অধিকাংশ রবীন্দ্র, শরৎ, সমরেশ, শীর্ষেন্দু, জীবনানন্দ, মহাদেব, নির্মলেন্দু–র বই পড়া হয়েছে তার। আমি আশ্চর্যান্বিত! এই গ্রামে থেকে এটা সম্ভব হলো কিভাবে? আমি যেখানে সব এখনো পড়িনি, এতো অল্প বয়সে সে এতো সব পড়লো কিভাবে?

কথায় কথায় জানতে পারলাম তার বাবার সাহায্যেই সে এতো দূর এগিয়েছে। আমার হৃদয়ে নিজের অজান্তেই তার স্থান দিয়ে ফেললাম। বাড়িতে গেলে ভালো লাগে না, খাওয়া–দাওয়ায় অনিয়ম শুরু হলো।

তখন ছিল শ্রাবণ মাস। বৃষ্টির মধ্যেও তাকে দেখার জন্য স্কুলের সামনে যেতাম। কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম তাকে। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। সম্ভবত সে বুঝেও না বোঝার ভান করতো।

দুই চার দিন পর বুঝতে পারলাম সেও কি যেন একটা বলতে চায় আমাকে। শেষে এক বন্ধুর মাধ্যমে প্রস্তাবটা দিয়েই বসলাম।

তাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

প্রথমে দুই তিন দিন সে নীরব।

ঠিক থাকতে পারছিলাম না। অবশেষে ২৩ জুলাই ২০০২। তার ভালোবাসার স্বীকৃতি পেলাম। সেই প্রথম হাত রেখেছিল আমার হাতে। সেদিনই প্রথম নারীর স্পর্শ পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার দেহে বহু পাওয়ারের কারেন্ট বয়ে গেল।

এরপর প্রতিদিনই দেখা করতাম আমরা। কখনো স্কুলে, কখনো কলেজের পাশে। আস্তে আস্তে আমার ছুটি শেষ হয়ে গেল। আসার সময় ছল ছল চোখে শুধু বলতে পারলাম, চলে যাচ্ছি।

উত্তরে সে বললো, ট্রেনের জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকে যখন তোমার চমৎকার চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে যাবে, মনে করো আমি তোমায় স্পর্শ করছি।

হস্টেলে এলেও মনটা আমার পড়ে রইলো সেই দুরন্ত মেয়ের কাছে। মাস খানেক মনকে কষ্ট দিয়ে ক্লাস মিস করেই চলে গেলাম আমার হৃদয়েশ্বরীর কাছে। মনে হলো অনেক অনেক বছর পর তাকে আবার দেখলাম।

সুখের সময়গুলো দ্রুতই বয়ে যায়। সেই দিনগুলোর মধ্যে একটি দিন আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে থাকবে। সেই দিনটায় যা ঘটেছিল সেটার বর্ণনাই আসলে আমার লেখার মূল বিষয়।

বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। অনেকটা কাকভেজা হয়েই এক বন্ধুর বাসায় তাকে নিয়ে গেলাম। চোখে সোনালি ফ্রেমের ১.২৫ পাওয়ারের চশমা আমার। পানি লেগে সামনে সব ঝাপসা। বন্ধুর বাসায় সেদিন কেউ ছিল না। বন্ধুও আমায় সুযোগ দিয়ে কি একটা কাজে বাইরে চলে গেল।

রুমে আমি এবং আমার দেবী। শ্যামলা বর্ণের বলে তার নতুন নামকরণ করেছি দেবী। প্রচণ্ড ভীতু আমি। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না।

হঠাৎ তার হাতের স্পর্শ পেলাম। এরপর বললো, তোমায় একটা সারপ্রাইজ দেবো। তবে শর্ত আছে। তোমার চোখ বন্ধ করতে হবে।

বাধ্য ছেলের মতো চোখ বন্ধ করে অপেক্ষায় আছি কিছু একটা পাবার আশায়। এক সময় আমার ঠোঁটের ওপর তার নরম ঠোঁটের স্পর্শ পেলাম। কিছু বোঝার আগেই সরে গেল স্পর্শটা।

শরীরের রক্ত উত্তপ্ত পানির মতো টগবগ করছে। হঠাৎ করেই সাহসী হয়ে গেলাম। আমার অতৃপ্ত ঠোঁট দুটো চেপে ধরলাম তার ঠোঁটের ওপর। ফ্রেঞ্চ কিস-এর সংজ্ঞা আমার আগেই জানা ছিল। কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুত পতন এবং উষ্ণ আভা পাচ্ছি আমার মুখে।

অস্থির হয়ে উঠলো সে এতোটাই যে, আমার নাকের ডগায় বসানো চশমাটা ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেল।

চশমার প্রতি আমার খেয়াল নেই। নিষিদ্ধ কিছুর জন্য আমি পাগল প্রায়। সমস্ত বসন উন্মুক্ত করে সারা অঙ্গে বিচরণ করলেও বাধা দিল না সে। আমি আরো কিছু চাইলাম তার কাছে।

শুধু একটা কথা বললো সে, আমার এখনো ষোল বছর পূর্ণ হয়নি।

অনেক কষ্টে নিজেকে কন্ট্রোল করলাম।

আসার সময় বললো, সরি, তোমার চশমাটা ভেঙে ফেললাম। প্লিজ, হস্টেলে গিয়ে দুটো চশমা কিনে নেবে। একটা চশমা সব সময় পরবে না।

ভাঙা চশমাটা পকেটে নিয়ে চলে এলাম আমি।

আজও সেই চশমার ভাঙা টুকরো দুটো আমার কাছে আছে। মাঝে মধ্যে টুকরো দুটো বের করে চলে যাই সেদিনের স্মৃতিগুলোতে। এরপর অবশ্য তাকে স্পর্শ করার সময় চশমা খুলে রাখি সযত্নে। আরো বেশি ভালোবেসেছি তাকে। মাঝে মধ্যে মান-অভিমান হয়। সে সময়টা প্রচণ্ড ছটফট করি। শেষে ক্ষমা চেয়ে নিই তার কাছ থেকে।

এবার এসএসসি দেবে সে। এইচএসসি পাস করলে বিয়ে করবো আমরা। ততোদিনে আমিও ডাক্তার হয়ে যাবো।

অনেক দিন হয় বাড়ি যাইনি। শ্রাবণের এই দিনগুলোতে কবি নাসিমা সুলতানার মতো আমারও বলতে ইচ্ছে করে –

কতকাল তোমাকে দেখি না – কতদিন তুমিও আমাকে

দাও না বাগানের প্রথম কদমফুল, কামিনী, কমল
কতদিন উজ্জ্বল রোদের মতো
চুম্বনে তুলি না তোমার চোখের শিশির
কতদিন...

চশমার কথা মনে হলেই আলাদা শিহরণ অনুভব করি। চলে যাই সেই স্মৃতিতে, সেই বৃষ্টি ভেজা দিনটিতে, সেই স্পর্শগুলোতে...।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

কালার টেস্ট

– অমিত কুমার দে

ছোটবেলা থেকেই প্লেনের প্রতি ছিল আমার প্রচণ্ড দুর্বলতা। দেখা গেল ভরদুপুরে আমি মায়ের পাশে ঘুমিয়ে আছি। এমন সময় আমার কানে ভেসে এলো গো গো গো শব্দটা। অমনি দিলাম দৌড়। দৌড়াচ্ছি তো দৌড়াচ্ছিই। ওই মুহূর্তে আমার তর্জনী এবং চোখ (যে চোখগুলো রেডারের চেয়েও শক্তিশালী ছিল) হচ্ছে একদম 90^0 কোণে আকাশের দিকে পা দুটো কখনো আমার ছোট বোনের মাটির তৈরি সদ্য বানানো এবং রোদে শুকাতে দেয়া সাদ্দাম আকৃতির পুতুলটাকে থেতলিয়ে বুশ বানাচ্ছে আবার কখনো পাশের বাড়ির কাকির রোদে দেয়া আতপ চাল (যেগুলো পূজোতে লাগবে) মাড়িয়ে এলোপাতাড়িভাবে আমার আগে ছুটছে আর আমার মুখ (যেটা সাধারণত বকা দিতেই পছন্দ করে) শুধু বলেই যাচ্ছে, ওই প্লেন গেল, প্লেন গেল....প্লেন!

এভাবে এক সময় প্লেনটা অদৃশ্য হয়ে যেতো আমাকে এবং আমার বন্ধুদের ফেলে রেখে। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আমার শাস্তি এবং শাস্তির ক্ষতিপূরণ হিসেবে সন্ধ্যা বেলা বাবার একটা খেলনা প্লেন কিনে আনা। এভাবেই চলছিল দিনগুলো।

এর কয়েক বছর পরই শুরু হলো রচনা লেখা হাই স্কুল কিংবা কলেজে *মাই এইম ইন লাইফ*। সবাই লিখতো, ডাক্তার–ইঞ্জিনিয়ার।

একমাত্র আমিই লিখতাম I want to be a pilot. এভাবে একদিন এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হলো। রেজাল্ট বের হলো। এবার কুর্মিটোলার ফ্লাইং ক্লাব (পাইলট ট্রেনিং কেন্দ্র)–এ চান্স পাওয়ার জন্য কঠোরভাবে পড়াশোনা শুরু করলাম। এবং লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম।

কয়েকদিন পরই ২৯ জুলাই কালার ভিশন টেস্ট হবে। প্রতি রাতেই কতো স্বপ্ন দেখতাম, আজ আমার ডিউটি আমেরিকাতে, কাল জাপানে, আরো কতো!

২৯ জুলাই চলে এলো। আমাকে একটা অন্ধকার রুমে নিয়ে লেজার রশ্মির মাধ্যমে কালার টেস্ট করানো হলো।

পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরলাম। মায়ের সঙ্গে কতোই না গল্প করলাম। একদিন রেজাল্ট বের হলো আর সেদিনই আমার স্বপ্নের প্লেন ভেঙে পড়লো। আমি কালার টেস্ট–এ উত্তীর্ণ হইনি।

সেদিনই ডাক্তারের কাছে গেলাম চোখ টেস্ট করাতে। আর ওই দিনটা থেকেই আমার চোখের সামনে বসে আছে একটা ভয়ংকর চশমা যেটা দিয়ে আমি আজও প্লেনগুলোকে শুধু ভেঙে পড়তে দেখি!

কুষ্টিয়া থেকে

অলৌকিকের সন্ধানে

– মোহাম্মদ জনাব আলী

পচাত্তর ছুই ছুই করছে আমার বয়স। আগামী আশ্বিনে সেটাও পুরে যাবে। সেদিন পর্যন্ত এই আকাশের নিচে এবং জমিনের ওপরে আমার অস্তিত্ব থাকবে কি না আল্লাহই রাখে তার খবর। লম্বা এ জীবনের সিংহ ভাগই পার করেছি চশমা চোখে দিয়ে, শুধু বদল করেছি কাচ।

জীবনের দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিয়েছি চশমা ব্যবহার করে। বহু ডাক্তারের দেয়া গ্লাস এবং নিজের পছন্দ মতো ফ্রেম নিয়ে আজ পচাত্তরের প্রান্তসীমায় এসে উপলব্ধি করছি যে, চশমাই জীবন, চশমাই অনুভূতি। এটা ছাড়া আমার জীবন অচল। হয়তো আমার বয়সী অনেকের একই রকম অবস্থা। প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে চোখের দৃষ্টি। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলাতে হচ্ছে চশমার কাচ।

একদিন চশমা ছিল শৌখিন ব্যবহার, আজ সেটা অপরিহার্য জীবন সঙ্গী।

ডাক্তার বলেছেন, ছানি নয়, গ্লকোমাও নয়। রেটিনায় আক্রান্ত হয়েছে আমার ডান চোখ। শুকিয়ে গেছে নার্ভগুলো, দৃষ্টি নিঃশেষ হয়েছে সে চোখের। সজীব হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই সে নার্ভগুলোর। বাম চোখটাও আক্রান্তের পথে।

ডাক্তাররা বার বার চোখ পরীক্ষা করেন, চোখের ভেতরের অসংখ্য ছবি তোলেন এবং ঘন ঘন চশমা বদলানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু মন তো হতাশায় ভরে যায়। শেষে কি বাম চোখের দশা ডানের মতোই হবে!

চশমার ভেতর দিয়ে দুনিয়ার কতো কি দেখেছি। পয়ত্রিশ হাজার ফিট উচু দিয়ে আকাশে প্লেনে ভেসে যাবার সময় আটলান্টিক মহাসাগরের উপর মেঘের সে রূপালী দৃশ্যের কথা আজও ভুলতে পারি না। চশমার কাচ ভেদ করে দেখা আমেরিকার স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার, নিউ ইয়র্কের চিড়িয়াখানার দুর্লভ সব জীবজন্তু, কেবল কারে বসে নদী পার হওয়ার সময় নিউ ইয়র্কের রাতের দৃশ্য, রাতে বিশ্ববিখ্যাত নায়াগ্রা ফলস–এর মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল জল পতনের নানান রঙের দৃশ্যপট এবং দিনের আলোয় জলপ্রপাতের মনোমুগ্ধকর অপরূপ সৌন্দর্য হৃদয়ে গেথে গিয়েছে। টরন্টো নগরীর ন্যাশনাল টাওয়ারের চূড়ায় উঠে চশমার ফাক দিয়ে দেখা চতুর্দিক বৃত্তাকারে প্রায় দুইশ কিলোমিটার ব্যাপী কানাডার নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য মনের মধ্যে দীর্ঘকাল উজ্জ্বল হয়ে আছে। চশমার এ শক্তির কল্যাণে নিজের দৃষ্টিশক্তির ও প্রাণশক্তির ওপর প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলাম এই বৃদ্ধ বয়সেও।

কিন্তু এখন সে প্রত্যয়ে যেন আর ভরসা মেলে না। বার বার মোছামুছি করেও চশমার কাচের স্বচ্ছতা ফিরে আসে না। চোখের ঝাপসাও কেটে যায় না। বাংলাদেশ মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের চোখ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাফিস, নিউ ইয়র্ক ও ঢাকার চোখ চিকিৎসাবিদ তার আমেরিকা থেকে আনা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে চক্ষু পরীক্ষা করে বার বার চশমা বদল করার পরও চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারছেন না। ডাক্তার মোস্তাফিজুর রহমানও পারেননি। ডাক্তার শামসুজ্জোহা তো ১৯৯৬–তে রেটিনার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।

আজ ২০০৩–এ বিশ্বের দৃষ্টি শক্তির প্রধান অবলম্বন চশমার ওপর ভরসা হারাতে বসেছি। আমার এতো দিনের সঙ্গী চশমাও যেন আমাকে উপহাস করে বলতে চাচ্ছে আর মোছামুছি করে লাভ নেই বন্ধু, এবার আমাকে বিদায় দাও। দীর্ঘ দিন সার্ভিস দিয়েছি, এবার মুক্তি চাই।

তবে কি সত্যিই চশমার ব্যবহার আমার চোখ থেকে উঠে যাবে! আমার চোখে কি তার প্রয়োজন নেই? আমার জীবদ্দশাতেই কি ধীরে ধীরে চোখে অন্ধকার নেমে আসবে? হারিয়ে যাবে আমার দৃষ্টি শক্তি? বিলীন হয়ে যাওয়া নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বী টুইন টাওয়ারের কথা না হয় বাদই দিলাম। স্ট্যাচু অফ লিবার্টির উর্ধ হস্তের

আলোর মশালের মতো আলোর ঝলক আমার চোখ কি আর কখনো দেখতে পাবে না? তবে কি আমি এই সৌন্দর্য ভরা পৃথিবীর নৈসর্গিক রূপ কখনো দেখতে পাবো না। আমার নেহাত আপন স্নেহাস্পদজনদেরও কি দেখতে পাবো না? এই দুনিয়া আমার জন্য কি অর্থহীন হয়ে যাবে যাকে এই দীর্ঘকাল ভালোবেসে এসেছি? চোখের রোগগ্রস্ত রেটিনা আক্রান্ত রোগীদের পরিণতি কি এই?

কেউ কি আমাকে বলতে পারেন এমন এক চোখ বিশেষজ্ঞের ঠিকানা যিনি আমাকে দিতে পারেন অলৌকিক কোনো চশমার সন্ধান যার সাহায্যে দেখতে পাবো পুরনো দিনের পৃথিবীর সব রূপ মাধুর্য?

হুসনা, বিরল, দিনাজপুর থেকে

এলার্জি

– বীরাঙ্গনা

প্রায় দুই বছর আগের ঘটনা লিখছি। এয়ারপোর্টের কাছেই ফিউমিনচিমোতে থাকতেন এক ভাই–ভাবী। ভাই খামার কর্তৃপক্ষের চাকরি করার সুবাদে ওই খামারে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট পান। তাজা মাছ, মাংস, তরিতরকারি খেতে পারেন। কয়েকদিন পর পরই গরু–খাসি জবাই দেন। রিজার্ভ মাংস শেষ হলেই আবার জবাইয়ের ব্যবস্থা। হানড্রেড পারসেন্ট হালাল এবং তাজা।

ওই ভাইয়ের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বড়ভাই ডাকতাম। বড়ভাই প্রায়ই ভাবী এবং বাচ্চাদের নিয়ে রোম থেকে ফিউমিনচিনো বেড়াতে যান। মাংস, সবজি, মাছ খেয়ে এসে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন। আমাকে যেতে বলতেন। কিন্তু কর্মব্যস্ততার কারণে যাওয়া হতো না।

একবার ছুটি পেয়ে বড়ভাই, ভাবীকে বলে তিনটা গাড়ি নিয়ে তিন চার পরিবারের সবাই সকালে ফিউমিনচিনো যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

আমি তখনো নতুন ড্রাইভার। রোম–এর বাইরে হাইওয়েতে গাড়ি নিয়ে যাইনি। যাদের সঙ্গে যাচ্ছি, সবাই পাকা ড্রাইভার। আট দশ বছরের ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা একেকজনের। নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। ভাবীকে বললাম, ভাবী, খুব ভয় লাগছে। রাস্তা চিনি না। তারা স্পিডে গাড়ি চালিয়ে আমাকে ফেলে চলে গেলে আমি তো বিপদে পড়ে যাবো। হাইওয়েতে সব গাড়িই স্পিডে চলে।

ভাবী বললেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আপনার ভাই আগে আগে আর আপনি পেছনে পেছনে যাবেন।

আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু হলো।

ভাই আমার কাছে এসে বললেন, সানগ্লাস দিয়ে চালাতে পারবেন তো? পথ দেখবেন তো?

বললাম, বড়ভাই, সানগ্লাস ছাড়া চোখই তো মেলতে পারি না, পথ দেখবো কেমন করে? সানগ্লাসই আমাকে চল চলতে সাহায্য করবে ছায়ার মতো।

বড়ভাই ডান দিক ঘেষে কিছুটা কম স্পিডে চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে যাচ্ছি।

আমরা ঠিকমতো গন্তব্যে পৌছলাম। প্রথম গাড়িটি আমাদের অনেক আগেই পৌছেছিল।

দুপুরে বিভিন্ন প্রকার টাটকা, হালাল এবং সুস্বাদু খাবার খেয়ে সবার ভুড়ি নিয়ে গড়াগড়ি। মেয়েরা সবাই রান্নাঘরে বসে গল্প–গুজব এবং ফল খাওয়ার পর্বে মগ্ন। ভাইয়েরাও ড্রয়িংরুমে আড্ডায় মগ্ন।

এক ফাকে ভাবী তাজা মাছের কথা তুললেন। অমনি খামার ভাবী এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, সবাই চলো সমুদ্র তীরে যাই। মাছও কিনে আনা যাবে।

আবার দল বেধে সমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। এবার বড়ভাই-ভাবী তাদের দলবল নিয়ে দুই গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

আমাকে বলা হলো খামার ভাবীকে নিয়ে স্কুলে গিয়ে ওনার বাচ্চা তুলে তারপর যেতে। তিনিই আমাকে রাস্তা চিনিয়ে নেবেন। সঙ্গে আরো থাকলো বড়ভাইয়ের বৃদ্ধা মাসহ অন্য একজন।

পথে গিয়ে গাড়িতে সানগ্লাস পেলাম না। ভুলে ভাবীদের বাসায় ফেলে গিয়েছি। ভাবলাম বিকেল হয়ে যাচ্ছে, সাগরের উত্তাল তরঙ্গ রোদ্রের প্রখরতাকে মলিন করে দেবে।

গাড়ি চালাতে গিয়ে দেখি, আমার অবস্থা শোচনীয়। লম্বা রাস্তায় যেদিকে যাচ্ছি ঠিক সেদিকে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। সূর্য ঠিক আমার গাড়ির গ্লাস ভেদে করে চোখে পড়েছে। আমিই যেন সূর্যমামার টার্গেট। রোদের খরতাপে দুই চোখে শুরু হলো অসহ্য জ্বালা, পানি পড়া, সে সঙ্গে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। চোখে যেন সর্ষে ফুল দেখছি। রাস্তা যেন ঠিকমতো দেখতে পারছি না। স্পিডও বাড়াতে পারি না। পেছনের গাড়িগুলো আগে যেতে পারছে না মাঝে মধ্যে আমার কারণে। খুবই নার্ভাস হয়ে গেছি। যেখানে সানগ্লাস ছাড়া রাস্তায় হাটতে পারি না সেখানে গাড়ি চালানো যে কি কঠিন সেটা আমিই শুধু উপলব্ধি করছিলাম হাড়ে হাড়ে।

কেবলই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে। এই বুঝি হয়ে গেল। গাড়িতে বৃদ্ধা মহিলা। অন্যের বৌ, সন্তান। হঠাৎ গাড়ির সামনের ডান পাশের চাকাটি রাস্তার বাইরে চলে গেল। ভাগ্যিস রাস্তা সমান্তরাল। শেষ পর্যন্ত ঠিকমতো সাগর পাড়ে পৌছালাম। তখন আর সাগর কিংবা সাগরের মাছ দেখার মতো মনমানসিকতা কোনোটাই আমার ছিল না। তবুও সবার অনুরোধে সামান্য একটু হাটলাম।

সবাই ইচ্ছামতো তাজা মাছ কিনলো। আমি অবাক হয়ে গেলাম ইলিশ মাছ দেখে এক লোকের কাছে। তিন চারটা তাজা ইলিশ শস্তায় কিনে ফেললাম।

প্রায়ই সন্ধ্যা হয়ে এলো। ফেরার পালা। সূর্যের প্রখরতা না থাকলেও আমার চোখের যন্ত্রণা, মাথা ব্যথা বিন্দুমাত্র কমেনি। এমন মাথা ব্যথা হলে একটানা লম্বা ঘুম না দিলে ভালো হই না। আমার গ্রুপ নিয়ে গাড়ি চালিয়ে ফিরছি। এক জায়গায় এসে ডান দিকে টার্ন নিয়ে ওভারবৃজে উঠতে হবে।

ভাবী পেছন থেকে বললেন, সামনে ডান দিকে যেতে হবে।

ততোক্ষণে বৃজ ছেড়ে সামনে চলে গিয়েছি। গাড়ির গতি কমিয়ে এক রকম থামাতেই পেছনে ঘ্যাচ করে হার্ড ব্রেক কষলো পাহাড়ের মতো এক মালবাহী বিশাল ট্রাক। আমার গাড়িতে সামান্য টাচ লেগেছে মাত্র। যেন আকাশ থেকে পড়লাম। ধাক্কাটা ঠিকমতো লাগলে তুলার মতো উড়ে যেতাম। দোষ তো আমারই। ওসব রাস্তায় পেছনে যাওয়ার সুযোগ বা নিয়ম কোনোটাই নেই।

ট্রাকের লোক নেমে পেছনের গাড়ি থামিয়ে ট্রাক পেছনে নিয়ে আমাকে বৃজে উঠতে সাহায্য করলো। ধন্যবাদ তাদের আন্তরিকতাকে। বৃজে উঠে আবার নিচে খাড়া নেমে পুনরায় খাড়া উপরে উঠে রাস্তা ধরতে হবে। এটা আসলে কোনো রাস্তা নয়। খামারে ঢোকার পথ শর্টকাট করার জন্য খামার ভাইয়েরা এ রাস্তা ব্যবহার করেন। আমি নিচে নেমে যখন উপরে উঠতে যাবো তখন গাড়ির এক চাকা গর্তে পড়ে গেল। মেইন রোডের বাতি ছাড়া কোনো আলোও নেই। মাথায়ও ঠিকমতো কাজ করছে না।

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে চার পাচ মিনিট চুপ করে বসে দোয়া-দরুদ পড়লাম।

খালাআম্মা বিজ্ঞের মতো ডিরেকশন দিতে লাগলেন।

কোনো কর্ণপাত না করে স্টার্ট দিয়ে আল্লাহর নামে একসিলারেটর-এ জোরে পা চাপ দিলাম। কিছু বোঝার আগেই ভো করে শব্দ করে গাড়ি রাস্তায় উঠে এলো। এরপর রোমে ফিরে এলাম সেই মাথা ব্যথা নিয়ে।

আজও সে কথা মনে হলে শরীর শিউরে ওঠে। আল্লাহর দরবারে হাজার শুকরিয়া অকৃপণ সাহায্যের জন্য। আমার মতো রোদে যাদের এলার্জি আছে তাদের নিত্যদিনের অতি প্রয়োজনীয় একটি জিনিস সানগ্লাস। সানগ্লাস কোনো ফ্যাশন নয় আমার কাছে।

রোম, ইটালি থেকে

বিতৃষ্ণা

– নাসিম আহমেদ

কিছু দিন আগে ভোলা থেকে ঢাকা যাচ্ছি লক্ষ্মীপুর হয়ে। যতোদূর মনে পড়ে, ঢাকা এক্সপ্রেসের কাউন্টারে গেলাম টিকেট নেয়ার জন্য। সানগ্লাসটা চোখ থেকে খুলে কাউন্টার কাম টেবিলে রাখলাম। লাঞ্চ খাবার জন্য টিকেট নিয়ে রেস্টুরেন্টে গেলাম। খাওয়ার মাঝ পথে মনে পড়লো সানগ্লাস বাস কাউন্টারে ফেলে এসেছি। ভাবলাম, বাসে চড়ার সময় অবশ্যই পাওয়া যাবে। লাঞ্চ সেরে কাউন্টারে গিয়ে জানতে চাইলাম, আমি একটা সানগ্লাস ফেলে গেছি কি?

কাউন্টারম্যান বলেন, হ্যা, আমরা একটা সানগ্লাস পেয়েছি। তবে কিছুক্ষণ আগে আমাদের মালিক সেটা চোখে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

ভদ্রমহোদয় ফিরবেন বিকেলে। আমার গাড়ির ছাড়ার টাইম আর মিনিট দশেক আছে। কি আর করা? এক বুক বিতৃষ্ণা নিয়ে বাসে উঠলাম।

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

অস্মিতা

– জাহিদুল আলম

অস্মিতা, আমার খালাতো বোন। ক্লাস এইট থেকে এসএসসি পর্যন্ত আমার সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছিল আমাদের বাড়িতে থেকে। সমবয়সী হওয়ায় তার সঙ্গে সব সময় আমার ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। স্কুলে ক্লাস ফাকি দিতাম কি না কিংবা স্যারের পড়া পারতাম কি না সেটা খেয়াল রাখতো সব সময় এবং মাকে এসে রিপোর্ট করতো। তাই মাঝে মধ্যে যখন মায়ের উত্তম-মধ্যম খেতাম তখন তার ওপর ভীষণ রাগ হতো। তবুও মায়ের জন্য তাকে কিছুই বলতে পারতাম না।

ক্লাস টেনে উঠেই একটা বদভ্যাস শুরু হলো আমার। সিগারেট খাওয়া শুরু করলাম। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার সময় খেলেও বাড়িতে কখনো খেতাম না। একদিন আমার রুমে বসে পড়ছিলাম। হঠাৎ সিগারেট খেতে ইচ্ছা হওয়ায় কিছু না ভেবেই রুমে বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম।

হঠাৎ দেখি ঝড়ের গতিতে অস্মিতার প্রবেশ। আমার মুখের সিগারেট টান দিয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে আম্মাকে নিয়ে এলো। অনেক মার খেলাম। সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অপবাদও শুনলাম আম্মার মুখ থেকে।

আম্মা চলে যাওয়ার পর দেখি অস্মিতা তখনো রুমে আছে এবং আমার অবস্থা দেখে মিটিমিটি হাসছিল।

আমার রাগ চরমে উঠে গেল। সোজা গিয়ে তার মুখে কষে একটা থাপ্পড় দিলাম।

ঘটনার আকস্মিকতায় সে স্তব্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চোখের জল লুকানোর জন্য রুম থেকে চলে গেল।

এরপর থেকে সে আগের মতো আমার সব কিছুর তদারকি করা ছেড়ে দিল। আমার রুমে খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আসতো না। আমি কথা বলতে চাইলে এড়িয়ে চলতো, ইতিমধ্যে আমার মনেও কেমন জানি অনুশোচনা বোধ হতে লাগলো। তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য চেষ্টা করতাম। কিন্তু তার নিস্পৃহভাবের জন্য পারতাম না।

টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল এরই মাঝে। সামনে এসএসসি পরীক্ষা। আমি কেমন জানি পড়ায় মন বসাতে পারছি না। শুধুই অস্মিতার সেই বিস্মিত চেহারা ভেসে উঠতে লাগলো মনে।

পরীক্ষার সময় এক সঙ্গে আসা-যাওয়া করায় কিছুটা সুযোগ হলো তার সঙ্গে কথা বলার। একদিন তার কাছে সে ব্যাপারটি তুলে সরি বলতেই সে বললো, প্লিজ জাহিদ, ওই ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাই। তুমি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলো না।

বুঝলাম সে খুব আঘাত পেয়েছে।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সে তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য আয়োজন করতে লাগলো। আমার চোখে ঘুম নেই। কারণ এখন থেকে সে আর আমাদের বাড়িতে থাকবে না।

একদিন সুযোগ পেয়েই তাকে বললাম, আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।

ভাবান্তর হলো না, শুধু ধন্যবাদ বলে চলে গেল।

অবশেষে সে চলে যাওয়ার দিন এলো। সকাল থেকেই বাড়িতে গুমোট পরিবেশ। বাড়িতে সবাই তাকে পছন্দ করতো। তাই তার চলে যাওয়াটা সবাইকে কষ্ট দিচ্ছে।

রুমে বসে তাকে নিয়ে চিন্তা করছি। এমন সময় দেখি সে আমার রুমে। চোখে কালো সানগ্লাস এবং গলায় একটা লকেট। এসব একবার তাকে তার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলাম।

কি চিন্তা করছো? তার জিজ্ঞাসা।

কিছুই না। মিথ্যা বললাম।

কিছুক্ষণ দুজনেই কথা বললাম না।

তারপর অস্মিতাই শুরু করে। জাহিদ, সেদিন তোমাকে এতো মার খায়ানোর জন্য দুঃখিত। আসলে এখানে আসার পর থেকেই তোমার প্রতি আমার কেমন জানি একটা টান অনুভব করতাম। তাই তোমার খারাপ কিছুই আমি মেনে নিতে পারতাম না।

এরপর তার গলা কেমন নিচু হয়ে এলো।

তার কাছে গেলাম। সানগ্লাসটা চোখ থেকে খুলে নিতেই চমকে উঠলাম। দেখলাম চোখগুলো পানিতে পরিপূর্ণ এবং ফুলে গেছে।

সে আবার বলতে লাগলো, জাহিদ, গতরাত আমি এক ফোটা ঘুমুতে পারিনি। নিজের সঙ্গে অনেক কম্প্রমাইজ করতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। হ্যা জাহিদ, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

আমি হতবাক। কারণ এ মেয়ে যে আমার মনের কথাই বলে ফেলেছে! তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, মাথা নিচু করে আছে। আমি তার মাথা উচু করে ধরলাম। চোখ থেকে বেয়ে পড়া জলগুলো মুছে দিলাম। বললাম, ভালোবাসি।

আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে ত্রস্তপদে রুম চলে গেল সে।

এরপর শুরু হলো অন্য পর্ব। সে পর্ব এক সঙ্গে চলার। সে পর্ব স্বপ্নের পর্ব।

নাজিরপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে

নাম

– তাহ্মিনা আবসার

সেই ছোটবেলা থেকেই চশমা পরার আকুলতা ছিল। কিছুতেই চোখ আর খারাপ হয় না। অবশেষে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় একটা সম্ভাবনা দেখা গেল। খুব মাথা ব্যথা ছিল। বড় আশা নিয়ে লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে গেলাম। নাহ! কাজ হলো না। কয়েকটা নোভালজিন ট্যাবলেট লিখে দিলেন ডাক্তার। চশমার নাম মুখেও আনলেন না। ভগ্নমনোরথে বাড়ি ফিরলাম।

বাবা চশমা পরেন। একদিন মজার ঘটনা ঘটলো। বাবার চশমা পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে বাবার অফিসে যাবার তাড়া। আমাকে ডেকে বললেন খুজতে।

খুজতে খুজতে বাবার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। চশমা আছে বাবার চোখেই। চশমা চোখেই তিনি চশমা খুজে বেড়াচ্ছেন।

আমার ছোট্ট মেয়ের খুব শখ ছিল সানগ্লাসের। বাজারে গেলেই সে বিভিন্ন রঙয়ের সানগ্লাস কিনতো। এবং গম্ভীরভাবে সানগ্লাস চোখে দিয়ে বেড়াতে বের হতো, সে হোক দিন বা রাত।

শীতের রোদে সরষের তেল মেখে মেয়েকে খালি গায়ে বসিয়ে রেখে ঘরে কি কাজে ঢুকেছি, খানিক পরে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, সে তার বাবার ইজিচেয়ারটা রোদে টেনে নিয়ে গম্ভীরভাবে বসে আছে। চোখে তার হলুদ সানগ্লাস। ঝাকড়া চুলে, নাদুস-নুদুস শরীরের সে সূর্য স্নান তখনি ক্যামেরাবন্দী করেছি। সেই ছবি আজও দেখি আর হাসি।

বেশ কয়েক বছর আগে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল রীমা হত্যাকাণ্ড। প্রতিটি মানুষের মনে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছিল মনির ও তার প্রেমিকা খুকু নামের সে মহিলার প্রতি। সেই মহিলার একটি বিশেষত্ব ছিল বড় ফ্রেমের সানগ্লাস পরা। সারা দেশে তখন সেই সানগ্লাসও আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সেই সময় একদিন চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে দাড়িয়ে আছি। উদ্দেশ্য, ঢাকা যাবার টিকেট কেনা। সকাল এগারোটার দিকে খুব রোদ। তাই সানগ্লাস পরে দাড়িয়ে আছি। এমন সময় খুব কাছ থেকে আওয়াজ এলো খুকু নাকি?

চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। ভাবলাম আমার কোনো চেনা লোক বোধহয়। কিন্তু দেখলাম আশপাশে সব লোক নির্বিকার চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার চমকে ওঠার কারণ হলো, আমার নাম সত্যিই খুকু। পরে বুঝলাম সানগ্লাসের কারণে নরপশু মনিরের কুখ্যাত প্রেমিকার নামে টিজ করা হচ্ছে। সেই যে সানগ্লাস খুলেছি আর শত রোদেও পরি না।

রাজশাহী থেকে

জিম্মি

– লিটন আহমেদ

বন্ধু কমল আমার গলা জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কাদতে কাদতে বললো, দোস্ত, আমার মায়ের স্বপ্ন আমি পূরণ করতে পারলাম না। আমার দ্বারা আর লেখাপড়া হবে না।

রুমের এক কোণায় বসে গাজার স্টিক টানছে সবুজ।

বাবু আর জামান রাত নয়টার দিকে তিন বোতল বাংলা মদ নিয়ে এসে বললো, নে সবাই গলা ভেজা।

বিড়াল শুটকি মাছ পেলে যে রকম আনন্দিত হয় বোতল, তিনটা দেখে আমারও সেই একই অনুভূতি হলো। কারণ শুকনো সবজিতে আর হচ্ছিল না।

একই মেসে থাকি আমরা পাচজন। টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন থানায় আমাদের বাড়ি। জেলা শহরের নামকরা একটা কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছি এবার। আজকের রসায়ন পরীক্ষাটা খুবই খারাপ হওয়াতে আমাদের মানসিক অবস্থা ভালো না। একে তো প্রশ্ন জটিল, তারপরও কমনের বালাই নেই।

পরদিন সকালে নাশতা খাবার পর সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হলো, প্রথমে রূপসী সিনেমা হলে এক টিকেটে দুই শো দেখবো। তারপর সেক্সলোজির প্র্যাকটিকাল ক্লাস করবো।

কথা অনুযায়ী সিনেমা দেখার পর রিকশা নিয়ে চলে গেলাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ পতিতা পল্লি টাঙ্গাইলের কান্দাপাড়ায়।

সবুজ, কমল, বাবু, জামান একজন করে মাধবী নিয়ে রুমে প্রবেশ করলো। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো সানগ্লাস পরে ঊনিশ বিশ বছরের এক অনন্যার দিকে। প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে আমার কাছে মনে হলো এ যেন বলিউড-এর কোনো বিউটি কুইন। তার রেট মাফিক একশ টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট রুমে নিয়ে যাই।

আমি আনমনে তাকে এক দৃষ্টিতে দেখছিলাম। তার সিলকি চুল, ঝকঝকে দাত, সরু নাক এবং পীনোন্নত বক্ষ যুগল। আমাদের কলেজের যে কোনো সুন্দরী মেয়ে তার সামনে কিছুই না।

আমাকে একটা লুঙ্গি পরার জন্য দিয়ে সে তার সালোয়ার কামিজ খুলে ফেললো। অবশিষ্ট ব্রা, প্যান্টি খুলতে খুলতে আমাকে বললো, শুরু করো না কেন? প্রথম নাকি?

চরম উত্তেজনা অনুভব করছিলাম তার উরুসন্ধির দিকে তাকিয়ে। প্রথমেই তার ঠোটে একটা কিস করি। কিন্তু তার চোখের সানগ্লাসটা কেমন যেন বিরক্তিকর লাগছিল।

আমি সানগ্লাসটা খুলতে চাইলে সে বাধা দিয়ে বলে, এটা খোলা যাবে না। কারণ সানগ্লাস খুললে আমার প্রতি তোমার আকর্ষণ কমে যাবে। চোখের কালো সানগ্লাসটিই আমার বন্ধু, এটা না থাকলে আমার টাকা ইনকাম হয় না।

বললাম, তোমার মায়াবী, টানা টানা কালো চোখের গভীরে হারিয়ে যেতে চাই।

এক রকম অবাধ্য হয়েই সানগ্লাস খোলার পর যা দেখলাম তাতে সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ না করে পারলাম না। আমার পছন্দের নারীর ডান চোখটি অন্ধ। বাম চোখে দৃষ্টি থাকলেও ডান চোখটি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন এবং দেখতে শাদা বিবর্ণ। সানগ্লাস ছাড়া অনন্যাকে দেখে ভড়কে যাই। আমার কামনা বোধ লোপ পায়। কয়েক মিনিট আগের অবাধ্য অঙ্গটা নিস্তেজ হয়ে আসে।

তাকে বললাম, তোমার সঙ্গে সেক্স করবো না, টাকাটা তোমাকে এমনি দিয়ে দিলাম।

সে টাকা ফেরত দিয়ে বলতে লাগলো, করুণা করো না। শরীর খাটিয়ে রোজগার করি। কারো দয়ায় বেচে থাকতে চাই না। রেলওয়েতে চাকরি করা নিম্নবিত্ত পিতার একমাত্র এসএসসি পাস করা মেয়ে আমি। বাবা তার অনেক কষ্টের সত্তর হাজার টাকা নগদ যৌতুক দিয়ে আমাকে বিয়ে দিয়েছিল। চোখের কারণে আমার স্বামী-সংসার করাই হয়নি, আর তুমি তো ক্ষণিকের অতিথি।

জন্মগতভাবে এক চোখ অন্ধ থাকার জন্য পাইনি মা-বাবার ভালোবাসা। শ্বশুর-শাশুড়ির, ননদ-দেবরের অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে। পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে শুনতে হয়েছে কানাবুড়ি, কানাবেটির মতো গালিগালাজ। যে স্বামীকে সবচেয়ে ভালোবাসতাম সেই আমাকে চোখের জন্য শারীরিক নির্যাতন করতো।

আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল তার জন্য।

এক পর্যায়ে টাকা না নিয়েই দ্রুতগতিতে রুম থেকে বের হয়ে সোজা রাস্তায় চলে এলাম।

একটা গোল্ডলিফে আগুন ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম, আমার সামান্য পরীক্ষাটা শুধু খারাপ হয়েছে, তাতে কি? পাসের তো সম্ভবনা আছে। মেয়েটা জীবনের পরীক্ষায় তো ইতিমধ্যে ফেল করেছে। তার তো অনেক দুঃখ। একটা কালো সানগ্লাসই তার পেটের জ্বালা মেটানোর প্রধান অবলম্বন। সানগ্লাসের কাছে মেয়েটি সম্পূর্ণভাবে জিম্মি।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে

ভার্চুয়াল

- শওকত আলী

স্বর্গের দারোয়ান খুব হই চই শুরু করে দিল।

একজন লোক বিনা অনুমতিতে স্বর্গে প্রবেশ করতে চাচ্ছে।

দারোয়ান তাকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।

সেই লোকও নাছোড়বান্দা।

অবশেষে দারোয়ান তাকে স্বর্গের দেবদূতের কাছে নিয়ে গেল।

দেবদূতকে দেখেই লোকটা হড়বড় করে বলতে শুরু করে দিল, মিস্টার দেখুন, আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে কেন স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। আমি একজন সম্মানিত লোক, স্বর্গই আমার উপযুক্ত স্থান হওয়া উচিত।

দেবদূত কিছুক্ষণ ভ্রূ কুচকে থেকে গম্ভীর গলায় বললেন, কিন্তু আমি যতোদূর জানি, তোমাকে তো নরকে প্রবেশের টিকেট দেয়া হয়েছে। এই টিকেটে তো তুমি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না।

তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের সফটওয়্যারে কোনো ধরনের ঘাপলা হয়েছে। না হলে এই ধরনের ভুল হতে পারে না।

দেবদূত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সফটওয়্যার? সেটা আবার কি জিনিস?

এবার অবাক হওয়ার পালা ওই ব্যক্তির। তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আপনাদের স্বর্গে কোনো কমপিউটার নেই। তাহলে আপনারা আপনাদের হিসাবপত্র কিভাবে করেন।

দেবদূত বিরক্ত গলায় বললেন, কি যা তা বলছো। তোমাদের ধর্মগ্রন্থে কি স্বর্গের বর্ণনা দেয়া নেই, সেখানে কি কমপিউটারের কথা লেখা আছে?

লোকটা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে বলে, না সেটা বলছি না। কিন্তু ধর্মগ্রন্থে যে স্বর্গের বর্ণনা দেয়া আছে তা তো হাজার বছরের পুরনো স্বর্গ। এর মধ্যে পৃথিবী এতো এগিয়ে গেছে, স্বর্গও নিশ্চয়ই অনেক ডেভেলপ করেছে।

গাধার মতো কথা বলো না। দেবদূত ধমকে ওঠেন। তুমি কি কখনো সূর্যকে পশ্চিম দিকে উঠতে দেখেছো, মাছকে আকাশে উড়তে অথবা পাখিকে নদীতে সাতার কাটতে। এটা এমনই একটা সিসটেম যা কখনো ক্র্যাশ করে না। তাহলে কোন যুক্তিতে ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা পরিবর্তন হবে।

ঠিক আছে, আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আমার ফাইলটা পুনরায় রি–ওপেন করে দেখা হোক।

দেবদূত লোকটাকে হিসাবরক্ষক অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

অফিসার ফাইলপত্র ঘেটেঘুটে লোকটার ফাইলটা খুজে বের করেন। ফাইল উল্টিয়ে অফিসার চেচিয়ে ওঠেন, সর্বনাশ! ফাইলে দেখা যাচ্ছে, জীবিত অবস্থায় তুমি একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলে, তাও তৃতীয় বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দেশের। তাহলে তুমি এমন একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে নিজেকে কিভাবে সৎ এবং

আদর্শবান লোক হিসেবে দাবি করছো। তোমার জন্যে তো নরকই উপযুক্ত স্থান। সেখানে খোজ করলে তুমি তোমার অনেক বন্ধু–বান্ধবও পেয়ে যেতে পারো।

লোকটা এবার মরিয়া হয়ে ফাইলের কিছু পেপার কাটিংয়ের দিকে অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে ওঠে, তাহলে এগুলো কি? এ ছবিগুলোই প্রমাণ করে, আমার সময় দেশের লোকজন কতো সুখে ছিল। এখানে সবগুলোই হাসি–খুশি লোকজনের ছবি। আমার একেকটি সভায় হাজার হাজার লোকের সমাগম হতো। আমি অসৎ ব্যক্তি হয়ে থাকলে এটা কিভাবে সম্ভব?

হিসাবরক্ষক অফিসার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন, বুঝতে পারছি না তোমাকে নিয়ে আসলে কি করা উচিত। তোমার রিপোর্টের সঙ্গে তোমার কথাবার্তার কোনো মিল নেই। বেশ কমপ্লিকেটেড কেস। সবচেয়ে ভালো হয়, তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলো।

ঠিক আছে, সেই ভালো, লোকটা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরকে কখন পাওয়া যাবে?

এখানে সময় বলতে কোনো জিনিস নেই। হিসাবরক্ষক অফিসার ঠোট উল্টিয়ে বলে ওঠেন।

তাহলে আপনাদের এখানে আইনস্টাইন–এর টাইম অফ রিয়ালিটির সূত্র কাজ করছে।

এটা আবার কি জিনিস? অফিসার জানতে চান।

আইনস্টাইন হচ্ছেন অনেক বড় এক বিজ্ঞানী। এটা তার বিখ্যাত একটা সূত্র। আচ্ছা, তার তো আপনাদের এখানেই থাকার কথা।

হ্যা, এবার চিনতে পেরেছি। অফিসার বলে ওঠেন। কিন্তু তার মামলা তো এখনো বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।

কি বলছেন, এতো মহৎ একজন বিজ্ঞানী! তিনি এখনো স্বর্গে যাননি!

আমি ঠিক জানি না। তুমি এ ব্যাপারে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো।

অবশেষে এক সময় ওই লোক ঈশ্বরের মুখোমুখি হলো। বিনীতভাবে জানতে চায়, ঈশ্বর, প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আইনস্টাইনকে কেন এখনো স্বর্গে পাঠানো হচ্ছে না। তিনি মানুষের উপকারের জন্য কতো বড় বড় আবিষ্কার করেছেন। মানুষের সেবাই তো সবচেয়ে বড় ইবাদত, তাই নয় কি!

ঈশ্বর গম্ভীর স্বরে বললেন, তোমার এই বিজ্ঞানী আণবিক শক্তি নামের একটি ভয়াবহ জিনিসও আবিষ্কার করেছে। একেকটা আনবিক বোমা যখন একেকটা শহরকে গুড়িয়ে দেয়, লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায় তখন তুমি এর জন্য কাকে দায়ী করবে? যতোদিন তোমরা আণবিক বোমা তৈরি বন্ধ না করবে ততোদিন পর্যন্ত তো তোমাদের আইনস্টাইন স্বর্গে যেতে পারছে না।

কিন্তু ঈশ্বর, এর জন্যে তো আমরা মানুষরাই দায়ী। আইনস্টাইন তো নিশ্চয়ই মানুষ মারার জন্য আণবিক বোমা তৈরি করা হবে এ কথা আগে থেকে জানতেন না।

ঈশ্বর মৃদু হেসে বললেন, তোমার কথা আংশিক ঠিক। তোমাদের আইনস্টাইন ভালোভাবেই জানতো তার এই আবিষ্কারকে কি কাজে ব্যবহার করা হবে। তবে এটা ঠিক, এর ক্ষমতা যে এতো ভয়াবহ হবে এটা বোধহয় সেও জানতো না। ঠিক আছে, তোমার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছি। এতো দিনে নিশ্চয়ই তোমাদের বিজ্ঞানীর স্বর্গে যাওয়ার সময় হয়েছে। তাকে স্বর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

ধন্যবাদ ঈশ্বর। এবার আমার কেসটা একটু দেখবেন।

তুমি তোমার দেশের জনগণকে আনন্দে রেখেছিলে এটা কি তুমি প্রমাণ করতে পারবে?

অবশ্যই পারবো।

এই দেখুন। বলে লোকটা পকেট থেকে অনেকগুলো রঙবেরঙ–এর চশমা বের করে। লোকটা একটা চশমা এগিয়ে দেয় ঈশ্বরের দিকে। আমার দেশের চারদিকে যখন অন্যায়–অত্যাচার বেড়ে যেতো তখন আমার দেশের জনগণকে এই চশমা পরতে বলতাম।

চশমা চোখে দিয়ে ঈশ্বর অবাক হয়ে বলেন, আশ্চর্য! তোমার চশমা দিয়ে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

মজা তো এখানেই, লোকটা উৎসাহিত হয়ে বলে। আপনি এই চশমা পরলে আপনার চার পাশে ঘটে যাওয়া অন্যায়-অত্যাচার কিছুই দেখতে পাবেন না। আবার আমার দেশের জনগণ যখন কষ্টে থাকতো তাদের এই ভার্চুয়াল চশমা পরতে বলতাম। এই চশমা পরলে আপনার সামনে কল্পনার একটি জগৎ তৈরি হবে। এখানে আপনি যা দেখতে চান তা-ই দেখতে পারবেন। দুঃখ-কষ্ট আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ঈশ্বর মৃদু হাসলেন। তোমার চমৎকার আইডিয়াতে মুগ্ধ হয়ে এক্ষুণি তোমাকে স্বর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বর্গে যাওয়ার শেষ গাড়িটা একটু আগেই ছেড়ে গেছে। গাড়িতে একটা সিটই খালি ছিল। তোমার কথা মতো ওই সিটে তোমাদের বিজ্ঞানীকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তোমাকে পরবর্তী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

কোনো সমস্যা নেই। তা আপনাদের পরবর্তী গাড়ি কয়টার সময় ছেড়ে যাবে। লোকটা হাত নেড়ে জানতে চায়।

আজ থেকে ঠিক এক হাজার বছর পর। ঈশ্বর নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেন। ততোদিন পর্যন্ত তোমাকে নরকেই কাটাতে হচ্ছে। আমার মনে হয় তোমার কোনো সমস্যা হবে না। কারণ তোমার কাছে তোমার ভার্চুয়াল চশমা তো রয়েছেই। এটা দিয়েই তুমি দিব্যি স্বর্গ দেখতে পাবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

বিনিময়

- তন্দ্রা

আমি যখন ক্লাস ফোরে তখন টিভি দেখার এবং পড়ার সময় চোখ থেকে পানি পড়তে শুরু করলো। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা করে চশমা নিতে বললেন। প্রথম পাওয়ার চশমা চোখে দিয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছিলাম আব্বাকে জড়িয়ে। একজনকে দেখছিলাম চারজন করে। সব কিছু উচু-নিচু লাগছিল আমার। মাথা ঘুরে বসে পড়েছিলাম।

ডাক্তার বললেন, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। চশমা ছাড়া দূরের সব কিছুই ঝাপসা লাগে। খালি চোখে খুব কাছে থেকে পড়ালেখা করতে পারলেও বাইরে চশমা অবশ্যই লাগবে।

চশমা পরার পর থেকে বড় আপা আমাকে ক্ষেপাতো এই বলে, *আন্ধা গরু বান্ধা দে, যমুনারে বিয়া দে।*

এসএসসি-তে খুব ভালো রেজাল্ট করায় বাসায় মিষ্টি খেতে আসা পাড়ার এক বড় ভাই বলে বসলেন, *বোনডি, তুই চশমাডা খুল দিই, চশমা ছারা তোরে কেমন লাগে একটু দেহি।*

তার ধারণা চশমা ছাড়া আমি কিছুই দেখি না।

তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। বাড়িতে বুয়া আর আমি ছাড়া কেউ ছিল না। রিং আসা ফোনটা রিসিভ করতেই আমার নাম ধরে একলোক বললেন। তন্দ্রা, এলসি ৯৭ ডিএপি-র এইচএস কোড আর বি/এল তারিখটা জানাও তো।

দুষ্টুমি করে বললাম, আমার সামনে তো ফাইল নেই, কি করে বলবো।

লোকটা এবার রেগেমেগে বললেন, চোখে চশমা নেই? চশমা ছাড়া তো কিছুই দেখো না, কানা কোথাকার।

ক্ষেপে গেলাম বললাম, কি যা তা বলছেন আপনি, কতো নাম্বারে রিং করেছেন?

কেন এটা...৯৬৯ না।

নাম্বার তো ঠিক আছে। আমার নামও ঠিক বলেছেন। আমি যে চশমা পরি জানলেন কি করে?

এটা কি চট্টগ্রাম?

জি না, খুলনা। ইয়ার্কি মারার জায়গা পেলেন না।

দেখুন, আপনাদের নাম্বার আর আমাদের চট্টগ্রাম অফিসের নাম্বার একই। আমি ভুল করে কোড নাম্বার পুশ না করাতে এই অবস্থা, সরি...।

তা না হয় মানলাম। কিন্তু আমার নাম, আমি চশমা পরি, এসব জানলেন কিভাবে?

ম্যাডাম, ...০৩১ পুশ করে ওই নাম্বারে ফোন করে দয়া করে জেনে নিন তন্দ্রা নামের একজন আছে কি না। এবং সেও আপনার মতো চশমা পরে কি না। থ্যাংক ইউ।

কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর চট্টগ্রামে ফোন করে জানলাম লোকটার কথাই সঠিক। তন্দ্রার কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে লোকটাকে ফোনে দুঃখ প্রকাশ করলাম।

তারপর থেকে লোকটার সঙ্গে প্রায়ই ফোনে কথা হতো। আমার এক কপি ছবি কিংবা তার অফিসে গিয়ে এক কাপ চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতেন লোকটা। একবার খুব মিনতি করে পাচ মিনিটের জন্য অফিসে যাবার অনুরোধ করলেন।

বান্ধবীকে নিয়ে আচমকা হাজির হলাম একদিন। রুমে ঢুকে তাকে দেখে থ হয়ে গেলাম। স্মার্ট, সুদর্শন এক যুবক।

চেয়ার থেকে উঠে সবিনয়ে পেছনের সোফায় বসতে বললেন।

দুজনেই সোফায় বসে পড়লাম এক সঙ্গে। কিন্তু একি! কট কট করে কিসের শব্দ হলো? আড়চোখে তাকিয়ে দেখি সোফার এক পাশের হাতলে একটা কোটের উপরের অংশ আর নিচের অংশে আমি বসে পড়েছি।

একটু নড়েচড়ে বসতেই ভদ্রলোক কোটের পকেট থেকে একটা সানগ্লাস হাতে নিয়ে হেসে বললেন, ওকে। নো প্রবলেম।

বললাম, সরি, চশমাটা খুব দামি তাই না? কি চশমা ওটা?

বললেন, রে-ব্যান। আব্বা কিনে দিয়েছিলেন আমাকে। জানেন তো আব্বা বেচে নেই। সুতরাং এই চশমাটারও প্রয়োজন নেই। ইজি, প্লিজ...।

আপ্যায়ন শেষে হাসি মুখে বিদায় জানালেন আমাদের।

রিকশায় বসে বান্ধবী বললো, প্রথম দেখাই অঘটন ঘটিয়ে আসলি। ছেলেটা দেখতে সুইট, না?

মনে মনে ভাবলাম ও রকম হ্যান্ডসাম ছেলে কি আমার জীবনে কোনোদিন আসবে?

খুলনা নিউ মার্কেটে তন্ন তন্ন করে খুজলাম রে-ব্যান ইউএসএ। কোথাও পেলাম না।

এক দোকানি বললেন, তিন হাজার সাতশ টাকা দিলে এক সপ্তাহ পরে দিতে পারবেন।

কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে বাকি টাকা আব্বার পকেট মেরে ম্যানেজ করলাম।

যেদিন সানগ্লাসটা আনতে যাবো সেদিন সকালে সেই ভদ্রলোক চট্টগ্রাম থেকে ফোনে জানালেন, আপনার চশমাটা শেখ হাসিনার চশমার মতো একটু বড়। তাই খালেদা জিয়ার ফ্রেমের মতো ছোট একটা সোনালি ফ্রেম পাঠালাম। আজ দশটার দিকে *এসএ পরিবহন* থেকে নিয়ে নেবেন। হোম সার্ভিস দিলাম না।

ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আপনার সানগ্লাস ভেঙে আসার পর তো আর খবরও নিলেন না। রাগ করেছেন? ওই সানগ্লাসটার মতো আরেকটা রে-ব্যান চশমা কিনেছি আপনাকে গিফট দেবো বলে। কিন্তু আপনি তো অনেক দূরে...।ভালো আছেন?

হ্যা, খুব ভালো আছি। তোমাকে নিয়ে কল্পনায় ভাসছি আমি। তোমাকে দেখার পর থেকেই তো আমি উন্মাদ প্রায়। এ অবস্থায় তোমার খবর নিই কিভাবে?

কিছুই বলতে পারলাম না।

কয়েকদিন পরে সানগ্লাসটা দিতে গেলাম তাকে।

আমার আপাদমস্তক দেখে বললেন, চশমায় মানুষকে আসলেই ভদ্র-নম্র দেখায়। আগেরটার চেয়ে এ ফ্রেমে তোমাকে ভীষণ সুন্দরী লাগছে।

আগে কি দেখতে মন্দ ছিলাম?

ও কথা বলিনি।

পাশ থেকে সানগ্লাসটা দিলে চোখে লাগিয়ে অবাক হয়ে বললো, এটাতো আমার আগেরটার ডুপ্লিকেট, তাই না? থ্যাংক ইউ।

টুকটাক আলাপ শেষে হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে সে বললো, তন্দ্রা, তুমি তো জানো আব্বার মৃত্যুর পর তার ব্যবসা নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি। বিয়েটা কয়েক বছর পরে করলেই চলতো। কিন্তু তোমার মতো রুচিশীলা চশমা সুন্দরী হয়তো আর নাও পেতে পারি। আপত্তি না থাকলে তোমাদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবো, কি বলো?

নীরবতা দেখে আমার চোখ থেকে চশমাটা খুলে রেখে বললো, চশমা ছাড়া সত্যিই তোমাকে অসম্পূর্ণ লাগে। আমি কিছু বলার আগেই মুহূর্তে তার বুকের সঙ্গে আকড়ে ধরে বললো, প্লিজ কিছু বলে যাও।

সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ এ পরিস্থিতির সম্মুখীন জীবনে প্রথম। কথা না বাড়িয়ে ওই জড়ানো অবস্থায় বলতে বাধ্য হলাম, এ পরিবেশে অশোভন আচরণ করে আপনি অপমান করছেন আমাকে। আপনি আমার পরিচিত এ ব্যাপারটা বাড়িতে কেউ জানে না। জানলে বিপদ হবে আমার। প্রস্তাব পাঠিয়ে দেখুন। এবার ছাড়ুন আমাকে।

সহজে কি ছাড়ে! আমার ঠোট দুটোকে চুষে দুই মিনিট পরে তারপর ছাড়লো। বাড়ি ফিরে তার ওই আচরণ এবং আমাকে *চশমা সুন্দরী* বলার প্রতিবাদ করলাম ফোনে।

বললো, চশমা ছাড়া আয়নায় নিজেকে কখনো দেখেছো?

তারপর দুপক্ষের জানাশোনার পর তার পুরো ফ্যামিলি এলেন আমাকে দেখতে। তার মা অর্থাৎ আমার শাশুড়ি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন আমাকে। এবার আমার চশমাটা খুলে তার হাতের দুই আঙুল *ভি* চিহ্ন করে চোখের সামনে নাড়াতে থেকে বললেন, বলো তো মা, এখানে কয়টি আঙুল?

একঝাক মহিলাদের মাঝে ভীষণ বিব্রত বোধ করলাম।

আমার ছোট ননদ মায়ের হাতটা চেপে ধরে বললো, ওসব বাদ দাও তো মা, চশমাটা ভাবীর চোখে পরিয়ে দাও। ওই চশমার জন্যই তোমার ছেলে ভাবীকে পছন্দ করেছে।

শ্বশুরবাড়িতে এক ভাবী আমাকে দেখতে এসে স্বামীকে টিপ্পনি কেটে বললেন, তোমার বৌকে মহিলাদের স্কুলের চশমা পরা গীতা ম্যাডামের মতো লাগে।

রাগের মাথায় আমাকে রুমে ডেকে নিয়ে বললো, আজই তোমাকে কন্টাক্ট লেন্স কিনে দেবো।

বললাম, তাহলে চশমা সুন্দরীর কি হবে? চশমা ছাড়া তো তুমি আমাকে পছন্দ করো না।

ওকে, ঘরে-বাইরে তুমি আমার সঙ্গে যতোক্ষণ থাকবে, চশমা পরেই থাকবে, বাকি সময় দুচোখে লেন্স পরে কাটাবে।

এভাবেই দিন যাচ্ছে আমার।

ঠিকানা বিহীন

পূর্বরাগ

– চঞ্চল শাহরিয়ার

শহীদুল্লাহ আর্টস বিল্ডিংয়ের নিচ তলার বারান্দা। ভর দুপুর। চশমা পরা সুন্দরী একটা মেয়ে হাউমাউ করে কাদছে।

বাতাসে খবরটা আমার কানে এসে পৌছায়।

আমি তখন রোকেয়া হলের গেটে বান্ধবীদের রেখে ফিরছি।

মমতাজউদ্দীন আর্টস বিল্ডিংয়ের কাছাকাছি জায়গায় হাদির সঙ্গে দেখা। সে বলে, গুরু, তোমাকে খুজতেই বেরিয়েছি।

কেন?

দুঃসংবাদ।

কি?

আমার সঙ্গে গেলেই শুনতে পাবে।

আমিন কোথায়?

তারা সবাই শহীদুল্লাহ আর্টস বিল্ডিংয়ের নিচে তোমার অপেক্ষায়।

কথা না বাড়িয়ে হাদির সঙ্গে দ্রুত হাটি।

কলাভবনের এক কোণায় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীর জটলা। সবাই আহা, উহু করছে।

আমি ভিড় ঠেলে এগোলাম।

সবাই চুপ। যেন দেবতার আবির্ভাব। সবাই আমাকে সমীহের চোখে দেখছে। কেউ কিছু বলছেও না, বলার সাহসও পাচ্ছে না।

কান্নাকাটি করা মেয়েটির দিকে তাকালাম।

মেয়েটির উচ্চস্বরে কান্না তখন বন্ধ। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদছে। চশমা খুলে মাঝে মধ্যে চোখ মুছছে। আমার নাম উচ্চারণ হতেই সে একবার আমার চোখের দিকে তাকালো।

মেয়েটাকে চিনতে পারি। আমার সহপাঠিনী। শারমিন বা নাসরিন কি যেন নাম। চশমাওয়ালী বললে ক্লাসের যে কেউ তাকে দ্রুত চিনে ফেলে। মেয়েটা প্রতিদিন জলপাই রঙের ভেসপায় চড়ে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আসে। যার ভেসপায় চড়ে ক্যাম্পাসে আসে সে মেয়েটির কি হয় জানার ইচ্ছা করিনি কখনো। শুধু প্রতিদিন এক মোহনীয় মুহূর্তে মেয়েটির মুখোমুখি হই। এতোটুকুতেই আমি খুশি। মেয়েটি যেদিন শাদা রঙের শাড়ি পরে আসে সেদিন তাকে পরীর মতো মনে হয়। মনে মনে ওই পরীকে নিয়ে অনেক দিন কক্সবাজার *প্রবাল মোটেল*–এ শাদা বিছানায় মোহময় রাত কাটিয়েছি।

মেয়েটির কান্না কিছুক্ষণ দেখার পর হাদি মুখ খোলে। বলে, গুরু, মেয়েটির ভীষণ বিপদ। একমাত্র তুমিই তাকে উদ্ধার করতে পারো।

বলি, বিপদটা কি রকম?

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে আমিন বলে, শারমিন আজ পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা পর খেয়াল করে হলে প্রবেশপত্র নিয়ে ঢোকেনি। টিচারের কাছে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করে। কোনো অজুহাতে কাজ হয় না। বাধ্য হয়ে শারমিন রিকশা নিয়ে শহরে সাগর পাড়ায় যায়। বাসা থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে ফেরার পরে পরীক্ষার সময় অল্প ছিল। চার ঘণ্টা পরীক্ষা দেড় ঘণ্টায় যা লিখেছে তাতে সে পাস করতে পারবে না।

তো আমি কি করবো?

তুমিই ভরসা গুরু। আজকের পরীক্ষার খাতা দেখবেন শামসুর রহমানস্যার। তুমি একটু বললেই মেয়েটা পাস মার্কস পেয়ে যাবে। না হলে মাস্টার্সে...।

মেয়েটার জন্য দয়া দেখাতে তাৎক্ষণিকভাবে কষ্ট হয়।

হাদি আমার মনের কথা বুঝে ফেলে। বলে, গুরু, তুমি যা ভাবছো তা না। মেয়েটি ভালো। উপকার করলে মনে রাখবে। তার অনার্সের রেজাল্টও বেশ ভালো।

চশমাওয়ালী মায়া ভরা চোখে আমার দিকে তাকায়।

আমি কাত হয়ে যাই। বিকেল নাগাদ শামসুর রহমানস্যারের সঙ্গে দেখা করি। চশমাওয়ালীর রোল নাম্বার স্যারের হাতে ধরিয়ে দিই।

স্যার আমাকে এড়াতে পারেন না।

মাস্টার্সের রেজাল্টের দিন চশমাওয়ালী আমাকে হাদির মারফত খবর দেয়। শহীদুল্লাহ কলাভবনের সিড়িতে মুখোমুখি হই। তার সোনালি ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে তার মায়া ভরা চোখ দুটি দেখি। সে মাস্টার্সে পাস করার জন্য আমাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এই মুহূর্তে একটা বোকার মতো কাজ করে বসি। তাকে বলি, ওগো, তোমার চশমাটা একটু দেবে?

সে অবাক হয়ে বলে, কেন?

এমনি। একটু ছুয়ে দেখবো।

সে হেসে চশমাটা খুলে আমার হাতে দেয়।

চশমার সোনালি ফ্রেমে হাত বুলিয়ে তাকে ফেরত দিই।

সে চশমাটা পরে আর্টস বিল্ডিংয়ের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাড়ায়।

আমি বলি, আসি।

সে বলে, না।

কেন?

একটা কথার উত্তর দিয়ে যাও।

কি?

তুমি আমাকে এতো পছন্দ করো, তা কোনোদিন জানাওনি কেন?

কে বলেছে আমি তোমাকে পছন্দ করি?

আমাকে এক নজর দেখার জন্য তুমি প্রতিদিন প্যারিস রোডে দাড়িয়ে থেকেছো। ক্লাস লেকচার ফলো না করে ফলো করেছো আমাকে। আমাকে নিয়ে তুমি কবিতা লিখেছো, স্বপ্ন দেখেছো। আমাকে মাস্টার্সে পাস করানোর জন্য স্যারদের কাছে ছুটোছুটি করেছো। অথচ এতো সব কথা আমাকে শুনতে হয়েছে অন্যের মুখ থেকে। ভীরু কোথাকার।

আমার কৃতকর্মের জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইতে উদ্যত হই।

সে অভিমানে ঝর ঝর করে কেদে দেয়।

আমি তার কান্না মুগ্ধ হয়ে দেখি। ক্যাম্পাসে রাজ্যের সুন্দরী মেয়ে রেখে খুলনার চশমাওয়ালীর জন্য আমার মন কেমন করে।

কোটচাদপুর, ঝিনাইদহ থেকে

ফটোসান

– আ.কা. শামসুদ্দিন আহমেদ

১৯৬৫ সাল। গ্রাম থেকে শহরে এসেছি মা এবং ভাইবোন মিলে বাবার সঙ্গে থাকবো। আগেও ছিলাম, স্মৃতিতে নেই। একদিন বিকেলে আব্বা বাইরে যাবেন। সুন্দর প্যান্ট–শার্ট ইন করে পরা এবং চকচকে জুতা। কালো সানগ্লাস চোখে দিলেন। দেখতে ঠিক নায়কের মতো দেখাচ্ছিল। যদিও সেই বয়সে নায়ক সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা ছিল না।

নায়কের সঙ্গে পরিচিত হই ১৯৬৯ সালে সিনেমা দেখে। সেই দৃশ্য আজও আমার স্মৃতিতে বাধানো রয়েছে। সেই শিশু বয়সে সবার অলক্ষ্যে আব্বার কালো চশমা পরে আয়নায় ঘুরে–ফিরে কতোবার নিজেকে দেখেছি! ভালো লাগতো। কিন্তু আব্বার মতো অতো সুন্দর লাগতো না।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্লাস সিক্স–এ পড়ি। ছিলাম কুড়িগ্রাম মহকুমার ফুলবাড়ি থানায়। লালমনিরহাট থেকে পূর্ব দিকে সীমান্ত এলাকা। পাকবাহিনীর ভয়ে সীমান্তের সীমারেখায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম আমরা সবাই। যে ঘরে থাকতাম তার দশ গজ দূরেই ইনডিয়া।

লেখাপড়া নেই। আব্বার সহকর্মীর শ্বশুর কারী সাহেব। কারীদাদার সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে ফলিমারী শরণার্থী ক্যাম্পে যেতাম। কারীদাদা রেশন তুলতেন আর ঘুরে ঘুরে অসহায় সব মানুষ দেখতাম, কথা বলতাম।

কি এক কাজে দাদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ইনডিয়ার দিনহাটা মহকুমা শহরে। চশমার দোকান দেখে আমার চোখ এবং অন্তর আটকে থাকলো সানগ্লাসগুলোর রঙিন কাচে। একমাত্র আকাঙ্ক্ষা একটা সানগ্লাস।

দেশ স্বাধীন হলো। আব্বা মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন দেশে কর্মী সংকটের পুরস্কার স্বরূপ এ.এস.আই থেকে পীরগঞ্জের ওসি হয়ে চলে গেলেন আমাদের সেই সীমান্তে রেখে। আমার মা কিছু কিনতে একজনের সঙ্গে পাঠালেন দিনহাটা শহরে।

কি কিনতে গিয়েছিলাম তা আজ মনে নেই। তবে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে আমার কাঙ্ক্ষিত কুচকুচে কালো সানগ্লাস ঠিকই কিনে এনেছিলাম। চোখে দিয়ে হাটলে সবাই আমাকে দেখে হাসতো। একটু–আধটু লজ্জা পেলেও কেয়ার করতাম না। তেরো বছরের সেই কৈশোরের সুখানুভূতিতে সাতার কাটলাম।

মা, ভাই–বোন এবং মালপত্র তিনটা গরুর গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এলাম থানা সদরে সরকারি বাসায়। মায়ের হাতটান যাওয়ায় আমাকে সূর্য ওঠার আগে রওনা করিয়ে দিলেন রংপুরের দিকে দোয়া–দরুদ পড়ে বুকে ফু দিয়ে। সেই কালো চশমা পরে ধরলা নদীর ওপার লালমনিরহাট থেকে শাপটি বাড়ি, আবারও তিস্তা নদী পার হয়ে প্রায় ত্রিশ মাইল হেটে শেষে হারাগাছ এসে পৌছালাম। তিস্তা সেতু মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দিয়েছিল মাঝ বরাবর। তাই রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল। সে জন্যই এ হাটা।

সূর্য আমার রঙিন চশমার সামনে। পথে পাউরুটি এবং বিস্কিট খেলেও তেমন ক্লান্ত হইনি। রিকশায় শেয়ারে রংপুর পৌছালাম ঘণ্টা দেড়েক পরে। আরেক রিকশায় একা নবাবগঞ্জ বাজার ট্রাফিক সিগনাল পার হওয়ার সময় কে যেন আমার সানগ্লাস নিয়ে উচু স্বরে টিজ করলো। একটু ইতস্তত বোধ করলেও সেটা খুলিনি।

শেষে আব্বার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে সবার আড়ালে আয়নায় সানগ্লাস নাকে বসিয়ে নিজেকে দেখলাম ঠিক যেন ঝড়ের কাকের মতো দেখাচ্ছিল। সেই সঙ্গে একটু ইচড়ে পাকাও। ইচড়ে পাকা সংক্রান্ত ভাবনার আড়ষ্টতায় এরপর থেকে সবার সামনে আর পড়তাম না।

১৯৮৪ সাল। ছাব্বিশ বছরের যুবক। সবে চাকরিতে যোগ দিয়েছি। থাকতাম বোনের বাড়ি ডেমরায়। আমি সব পুরুষ প্রতিবেশীর গণশালা। জিয়া স্টাইলের সানগ্লাস পরতাম। এক দুলাভাইয়ের মন্তব্য, কালো কাচের

আড়ালে নাকি আমি সব যুবতীর রূপ–যৌবন সুধা পান করি। তখনকার প্রেমিকা এবং এখন বৌ মুখ মচকে বলতো উ–উ, উহ! কি ফুটানি।

১৯৯০ সালে ডাক্তার চিরসঙ্গী করে বসিয়ে দিল নাকের ওপর যেন আমার প্রিয় বান্ধবী, (স্ত্রী)–র সতীন। ফটোসান চশমা নিলাম। ছায়ায় চশমা, রোদে সানগ্লাস। বেশ কয়েকবার পাওয়ার বদলেছি। আব্বা–আম্মার চশমা বদল করে যাচ্ছি। ছেলেমেয়ের সানগ্লাস কয়েকবার কিনেছি। বৌ–এর মাথা ব্যথার জন্য চশমা দিল ডাক্তার। সেটা পরলেই বলতাম মাস্টারনি।

সে ক্ষেপে যেতো।

আমার মেয়ে তন্বী যখন চার বছরের, তন্ময় হয়ে কিছু দেখলেই চোখ ট্যারা হয়ে যেতো। ডাক্তার দেখালাম। দুই তিনজনকে বদল করার পর প্লাস সেভেন পাওয়ার দিল।

ঘাবড়ে গেলাম। ঘুম হারাম হয়ে গেল।

প্রতিবেশী আত্মার আত্মীয় ডাক্তারকাকার পরামর্শ, মেয়ে বড় হয়ে অসুবিধার কথা বললে তবেই চশমা দেবেন।

সেই পুরু চশমা দোকানেই রইলো। নয় বছর বয়সী মেয়ের চশমা দুই বছর ধরে নিয়মিত বদলে যাচ্ছি। মেয়ে চোখে চশমা রাখতে চায় না।

কিন্তু তেরো বছরের কিশোরী তন্ময়–এর ধারণা ডাক্তার তার চোখ ঠিক মতো পরীক্ষা করেও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। তাই তার চশমা কেনা হচ্ছে না।

বয়স বিয়াল্লিশে যোগ হলো রিডিং গ্লাস। নাকের ডগায় বসিয়ে ওপর দিয়ে বৌ–এর দিকে তাকালেই ক্ষেপে যায়। আমি নাকি তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাই!

বাসার কাছেই স্কুল। মেয়েকে স্কুলে দিতে যাই মাঝে মধ্যে। কখনো লুঙ্গি পরেও যাই। একদিন ফেরার পথে পচিশ ত্রিশ বছর বয়সী এক যুবতী আমাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানলো এবং ব্যঙ্গাত্মক সূক্ষ্ম হাসি হাসলো। কারণ খুজে বুঝলাম, আমার ফটোসান চশমা। মহিলা নিশ্চয়ই ভেবেছিল, লুঙ্গির সঙ্গে সানগ্লাস!

মধ্য বাড্ডা, ঢাকা থেকে

চাহনি

– জামাল উদ্দিন মন্ডল

মানুষ কাজের ফাকে বা নীরবে বসে স্বপ্ন দেখে। তেমনি আমিও এক পড়ন্ত বিকেলে পিচঢালা রাস্তার পাশে বসে তেমন কোনো স্বপ্ন না থাকায় পড়ালেখা করে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলাম।

হঠাৎ মিষ্টি সুরে মেয়েলি কণ্ঠে, হ্যালো, প্লিজ শুনুন।

এই আওয়াজ কানে আসতেই পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ঢিলেঢালা জামা পরা, শাদা গ্লাসের চশমা পরে আমার দিকে সে তাকিয়ে আছে।

ভ্রমর কালো চোখে আমার চোখ পড়তেই মেয়েটা হাসলো। হৃদয় হরণকারী সেই হাসি।

শাদা গ্লাসের চশমা পরাতে মেয়েটার চোখ দেখেই মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের *হৈমন্তী* গল্পের হৈমন্তীর কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, কালো কালো চোখ ভাষা ছাড়াই কথা বলতে থাকে। আর সে কথা বুঝতে হয় হৃদয় দিয়ে।

অবশ্য বোঝার মতো বয়স বা হৃদয় সেদিন আমারও ছিল বলেই মনে মনে ভালোবেসেছিলাম। সেদিন থেকে তাকে স্বপ্ন দেখছিলাম। মেয়েটার ঠিকানা না জানলেও নামটা জেনেছিলাম শিমু।

বিভিন্নভাবে মনের আঘাতে আজ ময়মনসিংহ থেকে সিলেট অবস্থান করছি। মাঝে মধ্যে বাড়িতে গেলে তাকে খুজি। কোনো চশমা বা সানগ্লাস পরা মেয়ে দেখলেই সেই দুটি চোখ খুজি। না পাওয়ার ব্যর্থতা নিয়ে সেই চাহনির দৃশ্যটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি।

শিমু, তোমার চাহনির দৃশ্যটা নিয়ে স্বপ্ন দেখে অপেক্ষা করবো। কারণ তোমার চাহনিতে বুঝতে পেরেছি, তোমার সেই সুন্দর বুকে অনেক ভালোবাসা জমা আছে। আর আমিও জমা রেখেছি শুধু তোমার জন্য। পড়ালেখা করে মানুষ হওয়ার স্বপ্ন ধূলায় মিশে গেছে শুধু তোমার চাহনিতে।

বালাগঞ্জ, সিলেট থেকে

প্রকৃত মানুষ

– পাপিয়া রহমান

তার চোখ দুটো কখনোই দেখতে পেতাম না। মুখটা ঘিরে থাকতো অটল গাম্ভীর্য। সে গাম্ভীর্যটুকুকে পরিপূর্ণ রূপ দিতো ওই সরু ফ্রেমের গোল গোল কাচে ঘেরা চশমাটা।

হ্যা, আমার স্যারের কথা বলছি। এই পরিণত বয়সে এসেও তাকে ভুলতে পারিনি। বরং বলা যায়, তার চশমাটাকে ভুলতে পারিনি।

১৯৫৬ সালের কথা। সবেমাত্র অ আ পড়তে আর স্লেটে আকা কাটা শুরু করতেই বাড়ির পাশের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন গুরুজনেরা। ব্যস। অবারিত খেলাধুলা আর আনন্দের ভুবনে যতি পড়ে গেল।

নয়টার সময় স্লেট, পেনসিল এবং প্রাথমিক ধারাপাত হাতে গুটি গুটি পায়ে স্কুলে হাজির হলাম। অন্য সব স্যারদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি যাকে দেখে ভয় পেতাম তিনি স্কুলের হেড স্যার। পুরো নাম মনে নেই, হেড স্যার বলেই সবাই তাকে সম্বোধন করতেন। প্রথমেই তিনি আমাদের ক্লাস ওয়ানে বসিয়ে দিয়ে পরিচয় নিলেন, তারপর ক্লাস টিচারকে আমাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অন্য ক্লাসে চলে গেলেন।

যে সময়টুকু ক্লাসে ছিলেন, সবাই মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

জীবনে প্রথম স্কুল আর প্রথম ক্লাস। সে কারণে ভয়ে, দুশ্চিন্তায় বুক দুরু দুরু করছিল। তার সঙ্গে যোগ হলো স্যারের গুরুগম্ভীর কথা আর চশমা ঢাকা চোখ দুটোর অপলক দৃষ্টি। মনে হলো ওই দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমাদের সবার ভেতরটা যেন দেখে দিচ্ছেন।

এরপর পাচটি বছর ধরে ওই চিকন ডাটের চশমা জোড়া আমাদের সবার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল। স্কুল জীবনের দুঃখ–কষ্ট, আনন্দ, হাসি–গানের সঙ্গে যেন তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। অংকস্যারের ক্লাসে দুটো অংক করে আনতে ভুলে গেছি। ভাবছি কি করে স্যারের মুখোমুখি হবো! পেটে ব্যথা বলে ছুটি নিতে গিয়ে হেড স্যারের চশমার মুখোমুখি। মিথ্যা বলতে গিয়ে আটকে গেল মুখে, সত্যি কথাটাই বেরিয়ে পড়লো।

গম্ভীর কণ্ঠে উপদেশ, ক্লাসে গিয়ে বসো। তারপর স্যারকে বললেন, ক্লাসের পর আমাকে যেন অংক করে দেখানোর মতো সময় দেয়া হয়।

ব্যস, ছুটির পর ক্লাসে আটকে থাকতে হলো। বাড়িতে এসে আবার দেরির জন্য জবাবদিহি করতে হলো।

টিফিন পিরিয়ডে ক্লাস ফাইভের ছেলেরা দল বেধে স্কুলের পাশের আম গাছে ওঠার চেষ্টা করতেই স্যারের চশমা পরা দৃষ্টি সেখানে উপস্থিত। সবাইকে ডেকে এনে নিল ডাউন করিয়ে রাখলেন পুরো টিফিন পিরিয়ডে।

পরদিন টিফিন পিরিয়ডে সবার চোখ চড়ক গাছ হয়ে গেল। ঝুড়ি ভরে বাজার থেকে কাচা আম কিনে আনিয়েছেন হেড স্যার।

সেসব ঝুড়ি থেকে আম স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীদের হাতে দেয়া হলো। তবে শর্ত একটাই যে কেউ গাছে উঠতে পারবে না। এরপর যদি কেউ ধরা পড়ে তাহলে কি করা হবে সেটা অনুল্লেখ্য থাকলেও আমাদের অজানা নয়। দিন কেটে যায়। ধীরে ধীরে আমরা ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত উঠেছি। চার বছর কেটে গেছে। এর মাঝে অনেক পরিবর্তন হয়েছে চার পাশে। পুরনো স্যার অনেকেই চলে গেছেন আবার নতুন এসেছেন বেশ কয়েকজন। কিন্তু পরিবর্তন হয়নি, শুধু একজনের। তিনি আমাদের হেড স্যার। তিনি আর তার চশমা একই ভঙ্গিতে আমাদের সবার কাছে সমানভাবে দৃশ্যমান রয়েছেন। পরিবর্তন শুধু একটাই, কঠোর প্রকৃতির স্যারের মুখমণ্ডলের অটল গাম্ভীর্যে যেন মাঝে মধ্যে সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও ছেদ পড়ে।

প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুল ছুটি দেয়ার আগে এক অনুষ্ঠান করা হয়। সব ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সঙ্গে শিক্ষকদের ভাবের লেন-দেনের জন্য এই অনুষ্ঠানে তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। আমাদের এ বছরই শেষ এ স্কুলে পড়ার। সামনের জানুয়ারিতে গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে ভর্তি হতে হবে সবাইকে। সে কারণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে মনটা খারাপ লাগছিল। গান, নাটক, কৌতুকের সমাহারে অনুষ্ঠান শেষ হলে আমাদেরকে রেজাল্ট ঘোষণার পালা।

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। ক্লাস ওয়ান, টু, থৃ, ফোরের রেজাল্ট ঘোষণার পর ফাইভের পালা। স্যার স্বভাবজাত গম্ভীর গলায় রেজাল্ট ঘোষণা করলেন। সবাই ভালো নাম্বার পেয়ে পাস করেছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এরপর ঘটলো এক আশ্চর্য ঘটনা।

স্যার চোখ থেকে চশমাটা খুলে হাতে নিলেন। তারপর নেমে হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। জীবনে যেন উন্নতি করতে পারি। প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারি এই আশীর্বাদ জানালেন আমাদের সবাইকে।

স্যারকে এখন আমাদের কাছে ভীতিকর মনে হচ্ছে না। তার চশমা ছাড়া চোখ দুটো যেন কি জাদুমন্ত্রে তরল হয়ে গেছে। মুখটা মনে হচ্ছে গভীর ব্যথায় ভরা। কয়েক মিনিট পর পুনরায় স্টেজে উঠে সবাইকে বিদায় জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

আমরা সংবিৎ ফিরে পেয়ে দৌড়ে গেলাম তার কাছে। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম।

তিনিও সবাইকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ বিয়াল্লিশটি বছর। আজকের এই ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির শিক্ষার ভিড়ে খুব মনে পড়ে হেড স্যারের কথা। তার চশমা ঢাকা চোখ দুটোর কথা। একজন প্রকৃত মানুষের কথা।

গাজীপুর থেকে

জামাইবাবুর একদিন

– এনামুল কবির খান

আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির নাম হুমায়ুন। মনে রাখার মতো তার চরিত্রে কিছু বৈশিষ্ট তো ছিলই, যেমন চমৎকার ব্যক্তিত্ব, পোশাক-আশাকে সচেতন। এবং আরো একটা বৈশিষ্ট ছিল মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা।

আমরা তখন ফার্স্ট ইয়ারে কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমাদের সঙ্গে কিছু পরীও ভর্তি হলো। পড়াশোনা বাদ দিয়ে বন্ধুটির একমাত্র কাজ তখন মেয়েদের মনোযোগ কিভাবে তার দিকে ফেরানো যায়।

প্রতিদিন সে কলেজে আসতে লাগলো সুন্দর জামা-কাপড় পরে এবং দামি পারফিউম মেখে। বছর শেষের আগেই সে অগ্রিম টাইটেল পেল *জামাইবাবু।*

একদিন নজরে পড়ার মতো খুব সুন্দর একটা সানগ্লাস চোখে ক্লাসে এসে হাজির আমাদের জামাইবাবু।

স্যার ক্লাসে ঢুকতেই সে সুন্দর করে সানগ্লাসটি বেঞ্চের ওপর নোটবুকের পাশে রেখে নড়েচড়ে বসলো। কেমিস্ট্রির ক্লাস। স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে জটিল সমীকরণ লিখে চলেছেন। আমরা সবাই গভীর মনোযোগে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে।

বাদ শুধু জামাইবাবু। তার সকল মনোযোগ তখন মেয়েদের দিকে।

স্যার যেন কিভাবে ব্যাপারটা টের পেলেন। শান্ত পায়ে হেটে এসে দাড়ালেন বন্ধুটির কাছে। চিবুক ধরে দাড় করালেন। অন্য হাতে সানগ্লাসটি বেঞ্চের ওপর থেকে তুলে নিলেন। তারপর তার চোখে সেটি পরিয়ে দিতে দিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই, তোমরা সবাই হাততালি দাও, দেখো কি সুন্দর লাগছে।

সবাই আমরা চুপ।

কিন্তু আমাদের বিপরীত দিকের বেঞ্চে বসা মেয়েগুলোই কেবল এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলো।

লজ্জায় বন্ধুর মুখ ঝুলে পড়লো।

ঘটনাটির পর হুমায়ুনের মধ্যে অবিশ্বাস্য এক পরিবর্তন দেখলাম। পড়াশোনার প্রতি দারুণ সিরিয়াস হয়ে উঠলো। নির্ঘাৎ যার ফেল করার কথা সে পরীক্ষায় বৃলিয়ান্ট রেজাল্ট করলো। আর পেছন ফিরে যেন তাকালোই না সে।

আমাদের এই জামাইবাবু আজ ঈর্ষা করার মতো এক সরকারি কর্মকর্তা। সানগ্লাস নিয়ে ঘটে যাওয়া সেদিনের সেই ঘটনা যা তার জীবনকেই পাল্টে দিয়েছিল, আজ অজস্র ব্যস্ততার মধ্যেও তার মনে পড়ে কি না কে জানে!

বাগেরহাট থেকে

অবলম্বন

– মোহাম্মদ এমদাদুল বারী

বীথির সঙ্গে সম্পর্কটা যেদিন শেষ হয়ে গেল সেদিন চশমা পরে তার সামনে গিয়ে দাড়ালাম।

অবাক দৃষ্টিতে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বললো, তোমাকে তো এর আগে কখনো চশমা পরতে দেখিনি! হঠাৎ চোখ খারাপ হলো কিভাবে?

বীথি আর আমি দুজনেই অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়তাম। সে ছিল সমাজতত্ত্বে। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। প্রতিদিন শহর থেকে শাটল ট্রেনে করে ক্যাম্পাসে আসতাম। বীথি থাকতো পুরনো শামসুন্নাহার হলে। বীথির সঙ্গে সম্পর্কের ইতি যেদিন ঘটে তার মাত্র দুই মাস তেরো দিন আগে তার সঙ্গে আমার পরিচয় চকসু ভবনের সিড়িতে। বীথির সহপাঠী আমার এক বন্ধু। সে-ই পরিচয়টা করিয়ে দিয়েছিল।

আমার চোখের কর্ণিয়াতে বসানো কন্টাক্ট লেন্সটা এতোদিন তার চোখেই পড়েনি। কিন্তু সেদিন পুরো লেন্সের চশমাটা তার দৃষ্টি এড়ালো না।

ইচ্ছা করেই সেদিন চশমাটা পরেছিলাম। চেয়েছিলাম, বীথি দেখুক, চশমা চোখে আমাকে কেমন দেখায়! কিন্তু এ চশমাই যে সেদিন আমার কাছ থেকে বীথিকে কেড়ে নেবে তা কে ভেবেছিল?

আমি প্রতারক, মিথ্যাবাদি ইত্যাদি নানান বিশেষণে বিশেষায়িত করে বীথি আমার স্বপ্নরাজ্যের রাজকন্যার আসন থেকে বিদায় নিল।

সেই থেকে আর কখনো চোখে লেন্স পরিনি। কালো ফ্রেমের পুরো লেন্সের চশমাটাই আমার সব সময়ের সঙ্গী হয়ে রইলো।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির কলা ভবনের জারুলতলা, দক্ষিণের বোটানিকাল গার্ডেন এসব জায়গায় এখন আর পা মাড়াই না। বীথি বিহীন জারুলতলা আমার কাছে বিবর্ণ। বোটানিকাল গার্ডেনে বিচিত্র সব ফুলকে কাগুজে

ফুল ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয় না। আমার সময় কাটে ক্লাস, লাইব্রেরি এবং চুপচাপ, একাকী বসে থেকে। বাসায়ও আচরণটা আগের মতো রইলো না। হই–হুল্লোড়, টিভি দেখা, বাইরে ঘুরতে যাওয়া, খেলাধুলা, সব বন্ধ হয়ে গেল। আমার রুমের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখলাম।

আমার এ পরিবর্তনটা যাতে বাসার কেউ টের না পায় সে জন্য সারাক্ষণ বই নিয়ে টেবিলে বসে থাকতাম। চোখের সামনে বই। কিন্তু মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠতো রঙিন সেসব দিন। এক সময় চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে উঠতো। হু হু করে উঠতো বুক। বাসার সবাই ভাবতো, আমি পড়ালেখায় মনোযোগী হয়েছি। তাই বিরক্ত করতো না কেউ।

একদিন আমাদের বাসায় কুমিল্লা থেকে বেড়াতে এলো সাবিহা। মায়ের চাচাতো বোনের মেয়ে। সে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। ভিক্টোরিয়া কলেজ তখন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির এফিলিয়েটেড। তাই সে কলেজে অনার্সের সবগুলো বিষয় চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির সিলেবাস অনুযায়ীই পড়ানো হতো। পরীক্ষাও হতো ইউনিভার্সিটির একই প্রশ্ন এবং সময়সূচি অনুযায়ী। সাবিহার চট্টগ্রাম আসার মূল কারণ ছিল ইউনিভার্সিটি থেকে সাজেশন সংগ্রহ করা।

আমাদের বাসায় যে কেউ একজন এসেছে তা টের পেলাম সাবিহা আসার দুই দিন পর। আমার সঙ্গে তার আগে কোনো পরিচয় ছিল না। তার উপর আমার আত্মকেন্দ্রিক ভাব দেখে সেও সাহস পায়নি আমার সঙ্গে কথা বলার।

একদিন মা বললেন, সাবিহাকে যেন ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাই।

সেদিন ২২ ডিসেম্বর ১৯৯০ সাল। তাকে নিয়ে ষোলশহর স্টেশন থেকে শাটল ট্রেনে চাপলাম। ট্রেনে বসার জায়গা পেলাম না। দরজার মুখে দাড়ানোর মতো একটু খালি জায়গা পেলাম।

সাবিহা ভীষণ সংকোচ নিয়ে আমার গা ঘেষে দাড়ালো।

বাতাসে তার এলোমেলো চুল আমার ঘাড়ে, মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। তা আলতোভাবে সরিয়ে দিচ্ছিলাম। এভাবেই ইউনিভার্সিটি স্টেশনে পৌছালাম। দুজনে রিকশা নিয়ে লাইব্রেরি ভবনের সামনে গেলাম। আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনে গিয়ে দেখলাম, পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত! প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর মিছিল চলছে।

সাবিহাকে নিয়ে দ্রুত জারুলতলায় গিয়ে দাড়ালাম। জায়গাটা উচু বলে চার পাশটা ভালো দেখা যায়। কিন্তু মিছিল দেখবো কি! প্রিয় এই জায়গাটিতে এসে চলে গেলাম রঙিন অতীতে। সেই বীথি, তার ফর্শা মুখ, বাতাসে এলোমেলো চুল, তার হাসি এবং গালে টোল পড়া।

হঠাৎ একটা ধাক্কা আর চিৎকার আমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম, আমার চোখে চশমাটা নেই। চশমা ছাড়া আমি আবার কিছুই ভালো করে দেখতে পাই না। তাই অন্ধের মতোই শুধু আশপাশে ককটেলগুলোর শব্দ এবং মানুষের আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম। প্রাণপণে তখন সাবিহাকে ডাকছিলাম। চেষ্টা করছিলাম চারদিকটা খুজে দেখতে। যখন অসহায়ের মতো কিছু একটা অবলম্বন খুজছি তখন দেখি কে যেন আমার চোখে চশমাটা পরিয়ে দিল।

চশমার একটা কাচ ভেঙে গেছে। ভালো কাচটি দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, সাবিহা আমার সামনে দাড়িয়ে আছে। তার মুখ ভয়শূন্য। কিন্তু চোখে পানি।

বললাম, সাবিহা, তুমি কোথায় ছিলে? আমি যে কখন থেকে তোমাকে খুজছি।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাবিহা বললো, সত্যি খুজেছিলেন?

বললাম, হ্যা, তোমাকেই তো খুজছিলাম। তুমি না থাকলে আমি হয়তো এখান থেকে বের হতেই পারতাম না। চশমা ছাড়া আমি যে কিছুই দেখি না।

কথা শুনে সাবিহা তার আবেগকে সামাল দিতে পারলো না। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আমার ওপর নির্ভর করতে পারবেন?
এই প্রথম সাবিহার স্পর্শ অনুভব করলাম। দুই হাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরে দেখলাম, দুই চোখে যেন দুটো মুক্তার দানা টলমল করছে। তার কাধে হাত রেখে বললাম, যদি ভরসা দাও তো এ চশমার আর প্রয়োজন নেই। বলেই আধভাঙা চশমাটা একটানে খুলে ফেলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলাম।

সিলেট থেকে

সরি

– মোহাম্মদ মাহামুদুল হাসান রাজীব

তখন ক্লাস টেন–এ পড়ি। নিয়মিত ক্লাসে যাই। হঠাৎ একদিন আমার চোখে পড়লো হালকা লাল চশমা পরিহিত একটি মেয়ে। মেয়েটিকে প্রথম দর্শনেই আমার ভালো লাগলো। জানতে পারলাম মেয়েটি আমাদের স্কুলে ক্লাস নাইন–এ পড়ে। নাম তার রিংকি।
আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল মেয়েটির হালকা লাল চশমা পরিহিত টানা টানা চোখ দুটি। যেই ভালো লাগা সেই কাজ। মেয়েটির উদ্দেশে চট করে একটি চিঠি লিখে ফেললাম এবং চিঠির মাধ্যমে জানালাম, তোমার চোখে জাদু আছে। তোমার চশমা পরিহিত চোখ দেখে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। চিঠিটি এক বন্ধু মারফত তার কাছে পাঠালাম।
কিছু দিন পর আমাদের স্কুলের পিয়ন আমাকে একটি খামের ভেতর মোড়ানো চিঠি দিয়ে গেল এবং জানালো চিঠিটি রিংকি দিয়েছে।
চিঠিটি পেয়ে আমি তো মহা খুশি। নির্জনে গিয়ে চিঠিটি খুলে দেখি এটি আমারই পাঠানো চিঠি এবং চিঠির নিচে লেখা আছে, *সরি আংকল।*
এই শেষ। তারপরে কিছুই হয়নি। অবশ্য মেয়েটিকে আমি এখনো ভালোবাসি।

কুষ্টিয়া সরকারি ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে

নিহত

– সাইফুল ইসলাম

২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা গেলাম। সে বছর আমার প্রথম একা ঢাকা যাওয়া। দিন তারিখ ঠিক মনে নেই। ভোর পাচটায় গাবতলী নেমে বন্ধুর দেয়া লোকেশন মতো ফার্মগেটে গেলাম তার মেস খুজতে। একশ উনিশ কিংবা একুশ নাম্বার বাড়ি। মোস্তফা রোড। UCC কোচিং সেন্টারের সামনে। ফার্মগেট ট্রাফিক সিনগালে দাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করলে ডান হাতের সড়কটি আসাদ গেটের দিকে চলে গেছে। একটু সামনে ডান হাতের সড়কটি ইন্দিরা রোড। আরো একটু সামনে গেলে আনন্দ সিনেমা হল মাঝে রেখে দুটি সড়ক ডানে ও বামে চলে গেছে। একটি গৃন রোড। অপরটি কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ।
কথা হচ্ছে, মোস্তফা রোড পেতে আমাকে আগে দরকার UCC কোচিং সেন্টার। অথচ ওই কোচিং সেন্টার কোন রোডে সেটা ছিল আমার অজানা। তাই কয়েকবার ফার্মগেট এলাকায় ঘোরাঘুরি করলাম। মোস্তফা রোডের কোনো ঠিকানা পেলাম না। ট্রাফিকের কাছে ফিরে এসে ওই রোডের কথা জানতে চাইলাম।

ট্রাফিক তো ট্রাফিক, তার বাবাও মনে হয় ওই রোডের নাম শোনেনি। এমন ভাব করে ট্রাফিক সাবলীল ঢংয়ে বললো, না তো ভাই! আমি ঠিক জানি না।

কয়েকজন ট্রাফিকের কাছে শুধালাম। কারো কাছে নতুন জবাব পেলাম না।

যাহোক, ট্রাফিক রোড না চেনায় মোটামুটি হতাশ হলাম। এক হাতে বৃফকেস, আরেক হাতে পানির বোতল নিয়ে এবার প্রতিটি সড়কে হেটে হেটে খুজছি। একবার ইন্দিরা রোড, একবার নজরুল ইসলাম এভিনিউ, আরেকবার গৃন রোড। প্রতিটি রোডে অন্তত পঞ্চাশ একশ গজ হেটে মোস্তফা রোড খুজছি। অথচ ট্রেস পাচ্ছি না। ওভারবৃজ পার হয়ে এপার–ওপার করছি।

এক পর্যায়ে ট্রাফিক সিগনাল থেকে রাস্তা পার হয়ে বাম পাশ ধরে নজরুল ইসলাম এভিনিউয়ের দিকে যাচ্ছি। এমন সময় একটি লক্কড়–ঝক্কড় মুড়ির টিন মার্কা টাউন সার্ভিস দেখলাম। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে আমার দিকে আসছে। আসছে মানে আমার কাছে। আমার সরে যাবার সময় হবে না এমন অবস্থা। নিয়ন্ত্রণ হারা বাসটি দেখে তো দিক–বিদিক জ্ঞান হারালাম। কোথায়, কোন দিকে, কিভাবে দ্রুত হাটলাম নাকি দৌড়ালাম, জানি না। মুহূর্তেই স্বাভাবিক হয়ে অনুভব করলাম, মনে হয় কোথাও ধাক্কা খেলাম। হাতে বৃফকেস ও পানির বোতল ঠিকই আছে। চোখের চশমাটি নেই। নিয়ন্ত্রণ হারা বাসটি ফুটপাথের নিচে চট বিছানো কলা বিক্রেতা ও পত্রিকা বিক্রেতার ওপর হামলে পড়লো।

পত্রিকা বিক্রেতা কোনো রকমে স্থান ত্যাগ করতে পারলেও কলা বিক্রেতার গায়ের ওপর দিয়ে বাসটি উঠে গিয়ে একটি টিঅ্যান্ডটি থামের সঙ্গে ধাক্কা খেল। কলা বিক্রেতা রক্তাক্ত জখম হলো গুরুতর ভাবে। তাকে লোকজন ধরাধরি করে হাসপাতালে নিল। দুই এক মিনিটের মধ্যে ঘটনাটি ঘটলো।

ইতিমধ্যে আমি দুই এক পা পেছনে গিয়ে চশমা খুজছি। দেখলাম চশমার এক হাত একজন লোকের সেন্ডেলে বেধে আছে পায়ের সঙ্গে। আরেক হাতসহ দুটি গ্লাস অন্তত পাচশ কুচি হয়ে রাস্তার কার্পেটিংয়ের সঙ্গে মিশে আছে। এক হাজার একশ টাকার চশমাটি গেল।

কি আর করা! চিন্তা করে কাজ কি? চশমা গেল, গেল। নিজের জীবন তো আউট হয়নি। এ কথা ভাবতে ভাবতে দুশ্চিন্তামুক্ত মনে দুর্ঘটনাস্থলে এগিয়ে গেলাম। ভিড় লেগে থাকা লোকজনের নানান মন্তব্য শুনছি ড্রাইভার ও বাস সম্পর্কে। একই সঙ্গে সরকারের চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধারের অনেক কথাও কানে এলো।

ইতিমধ্যে আমার ডান চোয়ালের উপরের অংশে চোখের নিচে সামান্য সুড়সুড়ি অনুভব করছি। শাদা রুমালে মুছে তাজা রক্ত দেখতে পেলাম। হাতের স্পর্শে বুঝতে পারলাম ক্ষতস্থান ফুলে গোল হয়েছে। বুঝলাম, বুদ্ধিশুদ্ধি শূন্যের কোঠায় নিয়ে যখন দিকবিদিক ছুটাছুটি করেছিলাম তখনই ধাক্কাটি খেয়ে চশমার গ্লাসে চোয়াল কেটেছি। কি আর করা! ওই অবস্থায় আবারও মোস্তফা রোড খুজতে পা বাড়ালাম। সিদ্ধান্ত নিলাম মেস না পেলে এফ রহমান হলে প্রতিবেশী ছোট ভাইয়ের রুমে উঠবো।

গৃন রোড ধরে পা বাড়ালাম। বেশ খানিকটা যেতেই UCC কোচিং পেলাম। তার একটু সামনে ডান দিকে গলি পথটি মোস্তফা রোড হিসেবে আবিষ্কার করলাম। ছোট সাইনবোর্ডে লেখা মোস্তফা রোড নামটি কিছু দিন আগে লেখা হয়েছে। টেনশন কাটলো। মেস পেলাম বটে। কিন্তু বন্ধুকে পেলাম না।

মেসের মামুন ভাই জানালেন, আমার বন্ধু হাবিব গতরাতে বাড়ি গেছে।

সিদ্ধান্ত নিলাম কাজে বের হবো। ড্রেস ছেড়ে গোসল করে ফ্রেশ হলাম।

ইতিমধ্যে মামুনভাই তুলা স্যাভলন কিনে এনে ক্ষতস্থানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেন। নাশতা খাওয়ালেন। ঘটনা জানার আগে মন্তব্যসূচক জিজ্ঞাসা করলেন ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিলাম কি না।

একই মন্তব্যসূচক জিজ্ঞাসা অনেক পরিচিতের কাছ থেকে শুনতে হলো।

তাদের সকলকে বললাম, টিউবওয়েলের হ্যান্ডলের ধাক্কায় ফেটেছে।

তিন দিন পর বাড়ি ফিরে এলাম কাজিনের দামি চশমা ভাঙার টেনশন নিয়ে, পরিচিত এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া তার অতি শখের বৃফকেসের কর্নার ভাঙা নিয়ে। ওই দুর্ঘটনায় আমার চোয়াল ও বৃফকেসের কর্নার সামান্য ক্ষতি হয়। কিন্তু চশমাটি নিহত হলো।

শংকরপুর, যশোর থেকে

ধন্যবাদ

– এ.এন ওয়াহিদ

গানের কথা আছে, *চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কি হবে!*

কাজল দিয়ে কাজ না হলেও চশমা দিয়ে চোখে দেখার পাওয়ার বাড়ানো যায়। তার প্রমাণ আমি নিজে। চশমা ব্যবহার করছি গত ত্রিশ বছর ধরে। বয়স যখন প্রায় চল্লিশ তখনই চোখের দেখার সমস্যা দেখা দিল। চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়ে চোখ পরীক্ষা করে চশমা পরা আরম্ভ করেছিলাম।

প্রথম কয়েক বছর ঠিকই ছিল। পরবর্তীকালে আবার চশমার পাওয়ার বদলাতে হলো। এখন আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। হবেই তো। বয়স তো আর কম হয়নি, সত্তর ছুই ছুই। চশমার কথা লিখতে গিয়ে অনেক ছোটখাটো স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

একবার এক প্রবীণ বয়সী ভদ্রলোক হজে যাবেন। বরিশালে যেতে লঞ্চে তার ক্যাবিনের সামনে বসে কি যেন পড়ছিলেন। হঠাৎ তার সামনে রাখা চশমার কেসটা একেবারে নদীতে পড়ে গেল।

ভদ্রলোক চিন্তায় পড়ে গেলেন। বললেন, এভাবে আমার অনেক চশমা হারিয়েছি। কেস ছাড়া এটা আমার কাছে মোটেই থাকে না।

ভদ্রলোকটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, মনে কিছু না নিলে আমার চশমার কেসটা আপনাকে দিতে পারি। তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করে অনেক ধন্যবাদ জানালেন।

একবার নিজে সউদি আরবে থাকাকালে আমার চশমাটা পবিত্র *আয়েশা মসজিদ*-এর ওজুখানায় ভুলে রেখে আসি। পরদিন সেখানে গিয়ে চশমাটা পেয়েও যাই অক্ষত অবস্থায়। সে চশমা এখনো ব্যবহার করছি।

কিছু দিন আগে চোখ পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। তারা বললো, ওষুধটা খান, পরে আসবেন।

অপেক্ষায় আছি কবে ওষুধ শেষ হবে। এদিকে ছোট লেখা পড়তে পারি না। অনেক কষ্টে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে চশমা লেখার কথা জানতে পারি।

চশমা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায়ও পড়েছি। সেদিন বাসে আমার চশমা এক ভদ্রমহিলার চুলের ফিতায় নয়, ক্লিপে আটকে যায়।

তিনি দয়া করে তা ফেরত দেন ও বলেন, এরপর থেকে চেইন দিয়ে চশমা গলায় ঝুলিয়ে রাখবেন আংকল।

চোখ আছে বলে দেখতে পাই। চশমা আছে বলে আরো ভালো দেখি। যার এসব নেই তার জন্য দুঃখ হয়। এ তথ্য প্রযুক্তি জগতে চোখ যার নেই কিংবা চোখ থেকেও যে দেখে না শুধু চশমার জন্য সহানুভূতি। মরণোত্তর চোখ দান করে তাদের ঋণ শোধ করতে চাই। এখনো দেখি। তাই সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

স্ক্রু

– সোহেল রানা

চশমা বলতে যা বোঝায় তা এখনো আমার কপালে ওঠেনি। বয়সের কারণে বা তারুণ্যের উচ্ছ্বলতায় এখন পর্যন্ত সানগ্লাস কপালে তুলেই বসে আছি। সানগ্লাস কেনার অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করছি।

একদিন আমরা দুই বন্ধু গুলিস্তানের ভেতর দিয়ে আসছিলাম। সানগ্লাসের দোকানের সামনে আসতেই মিশুর ইচ্ছা হলো সানগ্লাস কেনার।

দুজনে মিলে একটা সানগ্লাস পছন্দ করে দাম জিজ্ঞাসা করতেই দোকানি বললো, ভাইজান, দাম চাইলে তো চারশ টাকা। কিন্তু আপনাদের জন্য সাড়ে তিনশ টাকা।

এর আগে আমরা কখনোই গুলিস্তান ফুটপাথ থেকে সানগ্লাস কিনিনি। পরে অবশ্য অনেকবারই কিনেছি।

তাই অনভিজ্ঞতার ফলে মিশু দাম বলে বসলো একশ বিশ টাকা।

কিন্তু আমার মাথায় হাত। কারণ লোক মুখে শুনেছি, গুলিস্তানে সানগ্লাসের দাম ষাট থেকে আশি টাকার মধ্যে। তাই মিশুর পায়ে জোরে একটা চাপ দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দোকানি সানগ্লাস দিতে রাজি হলেও মিশু তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। দোকানির কথা একটাই, *দাম কইছেন, আপনাগো এইডা লইতেই হইবো।*

তখন আমরা সবে মাত্র এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। গুলিস্তানের ফুটপাথে আমরা কিই বা করতে পারি। তাই বলে এতো সহজে হার মানার পাত্র আমরা নই। শেষে বুদ্ধি করে দোকানিকে বললাম, একশ বিশ টাকাই দেবো। কিন্তু একই রকম দুইটা সানগ্লাস দিতে হবে।

সে তাতেও রাজি। অতঃপর দুটা সানগ্লাস নিয়ে আমরা খুশি মনে এসে নারায়ণগঞ্জের বাসে উঠেছি। সিটে বসে প্যাকেট খুলে সানগ্লাস পরতে গিয়েই সব খুশি উড়ে গেল। কারণ যে সানগ্লাস মিশু পছন্দ করেছিল সেটি ঠিকই আছে। বাড়তিটায় একটাও স্ক্রু নেই। হালকা করে আঠা দিয়ে লাগানো। একটু জোরে চাপ দিতেই গ্লাস আলাদা হয়ে গেল। কি আর করা! একটি সানগ্লাস নিয়েই বাসায় ফিরতে হলো।

আমার সানগ্লাস বদলানোর মূল কারণ হলো স্ক্রু পড়ে যাওয়া। কিন্তু বন্ধুদের জানাতাম মডেল চেঞ্জ। নতুন সানগ্লাস কেনার এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে স্ক্রু পড়বেই। কিন্তু এই স্ক্রু ঠিক করাতে গিয়েই বাধে বিপত্তি। এই তো মাত্র কিছু দিন আগে কালিবাজার গিয়েছি সানগ্লাসের স্ক্রু লাগাতে।

দোকানি বললো, একটা স্ক্রু লাগাতে পচিশ টাকা লাগবে। কোনো ভাবেই কম নেব না।

বললাম, চাচা ষাট টাকায় নতুন সানগ্লাস পাওয়া যায়। একটা সানগ্লাসের চারটা স্ক্রুর দাম তাহলে একশ টাকা। তাহলে তো সানগ্লাসের ব্যবসা না করে আপনি স্ক্রুর ব্যবসা করলেই ভালো করবেন।

তার উত্তর, *লাগাইলে লাগান, না লাগাইলে ফুটেন*।

কি আর করা! অগত্যা তাতেই রাজি হতে হলো। তাও আবার সানগ্লাসের অন্য স্ক্রুগুলোর সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। তবুও মেনে নিলাম এ জন্যই যে, *নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।*

আজ থেকে ছয় মাস আগেও আমার ধারণা ছিল, যে কোনো কারণই হোক, এ স্ক্রু সমস্যা শুধু আমার সানগ্লাসেই রয়েছে। কিন্তু আমার সে ধারণা বদলে দিয়েছে আমার এক বন্ধু পারভেজ। একদিন তার সানগ্লাসটি হাতে নিয়ে উল্টা–পাল্টা দেখছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়লো একটি স্ক্রুর জায়গায় অভিনব এক প্রযুক্তি। সেখানে ম্যাচের কাঠি এমনভাবে সেট করা হয়েছে যে, দেখে বোঝাই যায় না। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে তবেই বোঝা যাবে। দেখেই প্রযুক্তিটা ভালোভাবে মনে গেথে রাখলাম।

এর দুদিন পরই আমার সানগ্লাসের স্ক্রু হারিয়ে গেল। তখন আমিও একই প্রযুক্তি ব্যবহার করলাম। মিশুর বাসায় স্ক্রু পড়ে যাওয়ায় দুটি সানগ্লাস পড়ে ছিল। আমারটা দেখে সেও তার সানগ্লাসটি ঠিক করে ব্যবহার করতে লাগলো। আমাদের দেখাদেখি আরো অনেকেই দিয়াশলাই প্রযুক্তির শরণাপন্ন হলো। এখনো যদি শেরে বাংলা ছাত্রাবাসে (সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ) অনুসন্ধান করা হয় তবে কারো না কারো সানগ্লাসে এ প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যই দেখা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

দুই.

আমার শৈশব কেটেছে ফরিদপুর জেলার ছোট্ট, সুন্দর একটি গ্রামে। গ্রামের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে ছোট একটা নদী এবং অনতিদূর দিয়ে বয়ে গেছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কপোতাক্ষ নদ যা আমাদের এলাকায় এসে মধুমতি নাম ধারণ করেছে।

দিন কাটতো খেলাধুলা, দুষ্টামি আর মায়ের বকুনির মধ্য দিয়ে। সে সময়টা ছিল বড়ই মধুর। স্মৃতির পাতা থেকে এখনো সে দিনগুলো জীবন্ত ভেসে ওঠে।

প্রাইমারি স্কুলে পড়াকালে আমরা যে কয়জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম তারা সবাই পরবর্তীকালে পরস্পর থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করছি। এর মধ্যে শিরীন চট্টগ্রাম, আনিস আটরশি, মানিক খুলনায়, আমি নারায়ণগঞ্জে এবং মনিরুল মধুখালিতে। দীর্ঘদিন পরে এ বছর কোরবানির ঈদের কিছুদিন আগে আমি বাড়ি যাই। যেহেতু আমার পরিবারের সবাই নারায়ণগঞ্জে রয়েছে। তাই আমার ঈদের আগেই ফিরে আসার কথা। সবাইকে ছেড়ে একাকী আসন্ন ঈদের আনন্দ আমাকে বিষণ্ন করে তুলেছিল। হঠাৎ একটি খবর পেয়ে আমার বিষণ্ন চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। শিরীন বাড়িতে এসেছে। আনিস বাড়িতেই ছিল। অন্যরাও ঈদ উপলক্ষে বাড়িতে আসছে। ঈদ আমাদের সকল বাল্যবন্ধুদেরকে এক সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে।

দশ বছরেরও বেশি সময় শিরীনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। দুই একবার ক্ষণিকের জন্য দূর থেকে দেখলেও তার সামনে যাইনি বা কথা বলিনি। তাই খুবই সংকোচে আছি তার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে। তাকে দেখলে চিনতে পারবো কি না সেটাই ভাবছি। তাকে দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও সংকোচে তাদের বাড়িতে যেতে পারছি না। কোনো একটা উপলক্ষ খুজছিলাম। পেয়েও গেলাম। সে যেদিন এসেছে সেদিনই তাদের পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা মারা গেলেন।

সন্ধ্যার একটু আগে আনিসকে সঙ্গে নিয়ে জানাযায় নামাজ পড়তে গেলাম। নামাজ তখনো শুরু হয়নি। হঠাৎ মনে হলো কে যেন পেছন থেকে আমাকে ডাকছে। পেছন ফিরে আমি তো অবাক! অনতি দূরেই আমার কাঙ্ক্ষিত মানুষটি দাড়িয়ে এবং আরো আশ্চর্য ব্যাপার, তাকে দেখা মাত্রই চিনতে পেরেছি।

আনিসের হাত ধরে সামনে পা বাড়াতেই বিপত্তি। শৈশবে আমাদের সবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি শিরীনের সামনে যেতে চায় না। বুঝতে পারলাম সে বিব্রত বোধ করছে। কারণ সে *বিবাহিত* উপাধির অধিকারী হয়েছে।

একাই সামনে এগিয়ে গেলাম। এমনিতেই হাত-পা-বুক কাপছে। প্রচণ্ড ঘামছি। এর মধ্যে *মরার উপর খাড়ার ঘা* হয়ে দেখা দিল আরেক বিপত্তি। দিনের আলো বিদায় লগ্নে বিধায় সানগ্লাসটি চোখে ছিল না। ছিল টি শার্টের বুকে ঝোলানো। যেই মাত্র শিরীনের সামনে গিয়ে দাড়িয়েছি ঠিক ওই মুহূর্তেই সানগ্লাসের একটি স্ক্রু খুলে একটি গ্লাস ঝুলে পড়লো। ব্যাস, আর যায় কোথায়। আমার তো তখন এমন অবস্থা যে, *ধরণি তুমি দ্বিখণ্ডিত হও, আমি লুকিয়ে পড়ি।*

ধরণিও দ্বিখণ্ডিত হলো না, আমিও লুকোতে পারলাম না। কিন্তু সানগ্লাসটি লজ্জায় টিকতে না পেরে আমার বাম হাতের মুঠোয় লুকিয়ে পড়লো।

আমার এমন অবস্থা যে, কি বলবো, কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপার তার চোখে পড়েছে কি না জানি না। দুই মিনিট কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর নামাজ শুরু হয়ে যাওয়ায় সাক্ষাতের ওখানেই সমাপ্তি ঘটেছিল।

পাহাড়তলি, চট্টগ্রাম থেকে

ছিনতাই

– খন্দকার হোসেন আহমেদ

শুধু ঘুম ছাড়া চশমা আমার সার্বক্ষণিক প্রয়োজন। কারণ আমার চশমার দুই চোখের পাওয়ার মাইনাস দুই। ১৯৮৬ সালে বিয়ে করি। ১৯৮৭ সালে আমাদের প্রথম সন্তানের জন্ম। যখনই আমরা বেড়াতে যেতাম এবং আমার স্ত্রী তার চোখে গগলসটি দিতো অমনি আমাদের সন্তান ওটি নিয়ে চোখে দিতো। লুকিয়ে লুকিয়ে চোখে দিলেও রেহাই পেতো না। তার দৃষ্টি পড়তেই এবং তার মুখমণ্ডল কাছাকাছি সাইজের গগলসটি শোভা পেতো তার চোখে।

বর্তমানে ওই দৃশ্যগুলো আমাদের প্রীতিকর স্মৃতি। মজার অভিজ্ঞতা হলো, আমি ১৩ মে ১৯৯২ সালে ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হই মিশনে যোগদানের জন্য। ১২ মে ১৯৯২ সালের বিকেলে ছাড়পত্র নিয়ে গুলিস্থানস্থ *সানমুন টেইলারিং* থেকে আমার একটি থ্রি পিস ডেলিভারি নিয়ে মিরপুরের উদ্দেশ্যে দোতলা বাসে উঠি। জানালার পাশে বসি। একটু পরেই বাসটি ভরে যায়।

আমার পেছনে এক ভদ্রমহিলা চেচিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে আমার চোখে পরিহিত চশমাটি ছিনতাই হয়ে যায়। এতো দ্রুত ছিনতাইকারী বাসের বাইরে থেকে চশমা ছিনতাই করে পালিয়ে যায় যে, আমি তার মুখও দেখতে পাইনি।

ঢাকা থেকে

কাফের হত্যা

– ম. আলম

এক হুজুর বিয়ে করলেন ধর্মান্ধ আরেক হুজুরের সুন্দরী কিন্তু অশিক্ষিত মেয়েকে।

বাসর রাতে বর হুজুর তার নববধূর প্রতি হাত বাড়াতেই চিৎকার করে ওঠে বধূ বললো, একি করছেন আপনি? কোনো পুরুষ মেয়েদের শরীরে হাত দিলে পাপ হয় জানেন না?

হুজুর বললো, আইন এবং ধর্মমতে তুমি আমার বিবি। আমি তোমার খসম। তোমার শরীরের সব কিছু দেখা, ছোয়া আমার জন্য জায়েজ।

তাই বলে আপনি আমার সব কিছু দেখবেন, ধরবেন এটা ঠিক না।

যৌন তৃষ্ণায় অস্থির হুজুর এবার কৌশল করে বললো, দেখো, স্বামী-স্ত্রীতে একবার মিলন হলে সত্তরজন কাফের মরে। কতো পুণ্যের কাজ, চিন্তা করেছো?

আপনি আমার স্বামী হলেও দুই চোখে শরীরের সব কিছু দেখে আমার সঙ্গে মিলন করলে দুজনেরই পাপ হবে। আমার আব্বা হুজুর বলেছেন, স্বামী হলেও স্ত্রীর গোপন কিছু দেখা গুনাহ।

ধূর্ত হুজুর তড়িঘড়ি করে একটা গাঢ় কালো গ্লাসের চশমা তার স্ত্রীর চোখে পরিয়ে দিয়ে বললেন, এই চশমায় তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো?

স্ত্রী বললো, না হুজুর একদম অন্ধকার দেখছি।

হুজুর মিষ্টি হেসে বললেন, এ চশমা পরেই তোমার সঙ্গে আমি মিলন করবো। তোমার শরীরের সব আমি ছুতে ধরতে পারলেও কিছুই দেখতে পারবো না। অতএব পাপের প্রশ্নই আসে না।

আচ্ছা হুজুর, একবার মিলনে সত্তরটা কাফের মরে এই কথা কি সত্যি?

উত্তেজনায় দিশেহারা হুজুর *আলবৎ* বলে স্ত্রীকে জাপটে ধরে দুই তিন মিনিটের মধ্যেই ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

অতৃপ্ত স্ত্রী বললো, সত্তরটা কাফের কি মরলো?

হুজুর বললো, অবশ্যই।

বিশ্বাস করি না। মাত্র দুই তিন মিনিটে সত্তরটা কাফের মারা কি এতোই সহজ?

কালো চশমাটা স্ত্রীর চোখ থেকে হুজুর নামাতে চাইলে স্ত্রী বাধা দিয়ে বললো, আগে বলুন কয়টা কাফের মরেছে?

চতুর হুজুর এবার প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বললো, বিবির সঙ্গে মিথ্যা বলা পাপ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দশজন কাফের পালিয়ে গেছে।

তাহলে ওই দশজন কাফের তাড়াতাড়ি মেরে ফেলুন।

হুজুর ওই চশমা পরা অবস্থায় মনের আনন্দে আবার কাফের মারায় মগ্ন হলেন।

দীর্ঘক্ষণ পরে তৃপ্তির আহ্লাদে পরিপূর্ণ দুজন মরা কাফের গোনা ও তাদের পুণ্যের আলোচনা শুরু করলো।

হুজুর বললেন, দেখেছো বিবি, কতো কষ্ট করে কাফেরগুলো মেরেছি। দুই দফায় সত্তর কাফের মরে একদম শেষ। স্বর্গের দরজা আমাদের জন্য খোলা।

ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হুজুরের দুই চোখে তন্দ্রাভাব নেমে এসেছে মাত্র।

এর মধ্যেই স্ত্রী বললো, হুজুর, আপনার কাফের মারায় একদিকে আমি যেমন মজা পাচ্ছি, অন্যদিকে আমাদের পুণ্যও তো হচ্ছে, তাই না?

নিস্তেজ হুজুর ঘুমের ঘোরে বললো, হু।

এবার কালো চশমাটা হুজুরের চোখে পরিয়ে দিয়ে স্ত্রী বললো, হুজুর শুনছেন? ঘুমিয়ে পড়ার আগে আরো সত্তরটা কাফের মেরে তারপর ঘুমান।

হুজুর চশমাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিকট গর্জন করে স্ত্রীকে বললেন, নালায়েক দুষ্ট আওরত। কাফের হত্যা করতে করতে কি মোমিন মুসলমান শহীদ হয়ে যাবো?

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক